

জানুয়ারি-মার্চ 1999

# বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

দাম সাড়ে সাত টাকা

মানবাধিকার বনাম রাষ্ট্র  
ভোজ্য তেলের কারসাজি  
বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্তে  
পরিবেশ আইন-কানুন  
বন্যা নিয়ে আলোচনা



# বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মা

বর্ষ 21 সংখ্যা 1

জানুয়ারি-মার্চ 1999

## সূচিপত্র

আমাদের কথা ... 1

মানবাধিকার বনাম রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা :

আন্তর্জাতিক আইন ... 3

জি. এইচ. হার্ডি আর

টার ব্রাডম্যান শ্রেণী ... 7

ভোজ্য তেল ও ভেজাল ... 9

ভোজ্য তেলের ভোজবাজি,

হাতের কারসাজি কাদের? ... 13

বহুজাতিক কোম্পানি 'মনসান্টো'—

একই অঙ্গ বহু রূপ ... 16

বিষয় : পরিবেশ

পরিবেশ আইন-কানুন ... 20

পোখরান-দুই ও তারপর ... 25

গ্রন্থ প্রসঙ্গ :

শৃঙ্খলিত শিশুদের শৈশবের সম্মান...27

রিপোর্ট :

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা...28

পরিচ্রমা :

প্রাথমিকে ইংরেজী...30

পরিবেশ পাঠ : কলেজে এবার...31

মানবাধিকার : মার্কিনী ভারাইটি...31

## বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মা

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী

P 252, লেকটাউন, ব্লক A

কলকাতা 700 089

## আমাদের কথা

রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল গত দশ-ই ডিসেম্বর। দিনটি অনেকেই স্মরণ করেছেন। নানাভাবে। *বিওকিও* করেছে। কিছুটা উচ্ছ্বাসে ভেসেই। যান্ত্রিকভাবে। ছোট একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করে। যা একভাবে দেখতে গেলে অনেকের কাছে রাষ্ট্রের মাহিমা কীর্তন বলেই মনে হবে। আসলে চোখের সামনে দেখা যায় নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে মানুষ প্রতিনিয়ত, পদদলিত হচ্ছে তাদের ছোটখাটো সামান্য স্বাধীনতাটুকুও। এছাড়া ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতি মুহূর্তের বিপন্নতা বোধ তো আছেই। সব মিলিয়েই হয়তো এই প্রতিক্রিয়া। অলীক জেনেও এমন আপ্তবাক্যে সান্ত্বনা খোঁজার প্রয়াস। —এবং রাষ্ট্রের কাছে!

তবে মোহভঙ্গ হতে দেরি হয় না। যখন দেখি ধর্মের নামে একদল লোক অন্য এক গোষ্ঠীর মানুষের ওপর চড়াও হচ্ছে। তাতে মদত দিচ্ছে রাষ্ট্র। বা যখন দেখি এক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অন্য এক রাষ্ট্রপ্রধানকে শায়স্তা করতে মিসাইল-দেগে হত্যা করছে সে দেশের নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। এবং এই গা-জোয়ারিতে রাষ্ট্রসমূহকেও জড়াতে কসুর করছে না। অথচ রাষ্ট্রসমূহের সনদে দেশে দেশে এঁদের হাতেই সাঁপে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার ভার।

এমন আপ্তবাক্যে নিশ্চিত বোধ করার কারণ নেই। অনেকেই বলেছেন। বহুদিন ধরেই বলছেন। এবং বারবার বলেছেন। সম্প্রতি দেখলাম, আমাদের এক বন্ধুও সেকথার পুনরাবৃত্তি করেছেন সম্প্রতি লিখিত একটি নিবন্ধে (মে-আগস্ট 1998 সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। সেখানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রসমূহের সনদে রাষ্ট্রের হাতে এই দায়িত্ব সাঁপে দেওয়ার সাথে সাথে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, 'জাতির পক্ষে বিপজ্জনক ক্ষেত্রে এবং সরকারিভাবে ঘোষিত জরুরি অবস্থার সময়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ এই চুক্তিপত্রের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা থেকে সরে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।' ওই বন্ধুর প্রশ্ন— এটা 'বাঘের হাতে ছাগ-পালনের দায়িত্ব দেওয়ার-ই সামিল' হল না কি? রাত্ মনে হতে পারে ওর এই উক্তি। কিন্তু কথাটি অসত্য নয়। বিশেষ করে তাদের কাছে, সামর্থ্য ও সক্ষমতার মাপকাঠিত সিঁড়ির নীচের ধাপে অবস্থান যাদের।

তথাপি বিষয়টি আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেছে *বিওকিও*, অবশ্যই এই মুহূর্তে এর কার্যকারিতার কথা ভেবে নয়, ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। সেই কারণেই এই সংখ্যাতো এই বিষয়ে একটি আলোচনা প্রকাশিত হল।

দুনিয়াজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী লুঠপাট শুরু হয়েছে সেই কবে। অব্যাহত আজও, তবে ভিন্ন উপায়ে। দিন বদলেছে। বদলেছে ধরণ। বন্দুক হাতে আর লুঠন নয়। সেটা এখন থাকে আড়ালে। বরং পোশাকে থাকে উপকারীর ভেক।

হাতে জপের মালা—আধুনিক প্রযুক্তি। আর আধুনিকতম সংস্করণটি হল বায়োটেকনোলজি। সক্রিয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। উচ্চফলনশীল শস্যের বীজের থলি নিয়ে এগিয়ে এসেছে চাষীদের উপকারার্থে। যুগ যুগ ধরে লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষের মননে ও পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে বিপুল ও বৈচিত্র্যময় শস্যবীজের ভাণ্ডার। সেগুলিকেই সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে নাড়াচাড়া করে তৈরি হয়েছে আধুনিক বায়োটেক-সিডস—যার মালিক ওই কোম্পানিগুলো! অশ্রুতপূর্ব সব ধর্মের সৃষ্টি করেছে বীজের মধ্যে। নাকি কীট-পতঙ্গ ঘেঁষতে দেবে না ধারে কাছে। জন্মাতে দেবে না আগাছাদের। এবং শোনা যাচ্ছে এই বীজ থেকে উৎপন্ন শস্য হবে পুনরুৎপাদনে অক্ষম। অর্থাৎ অধিক ফলনের আশ্বাসে চাষীরা যদি একবার পড়ে এদের খপ্পরে, তাহলে চিরতরে ওই বীজ কোম্পানির খন্দের বন্ডে হবে তাদের! তেমন-ই এক কোম্পানির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল এই সংখ্যায়।

আমাদের চারপাশে দ্রুত ঘটে যাচ্ছে হরেক ঘটনা। যার তাৎপর্য বুঝে ওঠারও অবসর মিলছে না। তার আগেই কার্য সমাধা হয়ে যাচ্ছে। যেমন ভেজাল সরষের তেল নিয়ে ঘটল। এর সাথে যে বিদেশী স্বার্থেরও যোগ থাকতে পারে প্রশাসনিক মহলেরও — কে ভাবতে পেরেছে? এই নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে এই সংখ্যায়। এছাড়াও নিয়মিত কিছু বিভাগ তো আছেই।

বিওবি প্রকাশনার কুড়ি বৎসর অতিক্রান্ত হল। খুব বেশি লোকের কাছে তাৎপর্যের মনে হবে না এই ঘটনা। তবে আমরা তা মনে করি না। কারণ বিওবির মতো ক্ষুদ্র একটি উদ্যোগে কিছু লোক সামিল এখনও—সেটা কি কিছুই নয়? বিশেষ করে বিরাটের তপস্যাই যখন আজকের বাণী। আর এই উদ্যোগ জিইয়ে রাখার উৎসাহে এতদিনেও ভাঁটা পড়ে নি কিছু গ্রাহক ও পাঠক-বন্ধুর—সেটা কি কম তাৎপর্যের!

স্মরণ

আমাদের বন্ধু নিশীথ [চৌধুরী] গত বিশেষ জানুয়ারি [1999] রাত্রে মারা গেছে। আমরা একজন বন্ধু হারালাম। মৃদুভাষী শান্ত স্বভাবের মানুষ নিশীথের লেখা ছড়া আপনারা বিওবির পাতায় দেখেছেন। কিছুকাল যাবৎ এক ধরণের ফুসফুসের অসুখে ভুগছিল নিশীথ। অসুখ কি যে ঠিক কি, শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট করে ধরাও যায় নি। ফলে চিকিৎসা-বিদ্রাটের শিকার হতে হল তাকে।

## গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিন

বাৎসরিক গ্রাহকদের গ্রাহকপদের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে গত ডিসেম্বর '98 তে। অনেকের আটানববই-এর গ্রাহক চাঁদাও বাকি রয়েছে। অনুগ্রহ করে গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিন। গ্রাহকচাঁদা কিছুটা বাড়তে হলো। একান্ত নিরুপায় হয়েই। তিরিশ টাকা করা হয়েছে।

# মানবাধিকার বনাম রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা : আন্তর্জাতিক আইন

মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে

অধ্যাপক অটো কিমিনিশ্

এই গ্রন্থে মানুষের ইতিহাস হয়তো দশ সহস্র বর্ষের ; মানবিক ধ্যান-ধারণার প্রভূত প্রতিষ্ঠানও সুপ্রাচীন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, সময়ের বিচারে মানবাধিকারের ধারণাটি প্রায় নবজাতক। অথচ মানবাধিকারের ধারণাই বিশ্বের প্রথম সর্বজনীন ধারণা, যা ধর্ম, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি সংক্রান্ত ধ্যানধারণার মতো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বা মানবগোষ্ঠীতে সীমায়িত নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মানবিক অধিকার হরণের ঘটনাটি যৌথভাবে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রসংজ্ঞার পূর্বসূরী লীগ অফ নেশনস বিভিন্ন সূত্রে মানবাধিকারের প্রশ্নটি বিবেচনা করে। কিন্তু তা সংবদ্ধ রূপ পাবার আগেই আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যার সাথে জড়িয়ে রয়েছে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিষ্ঠুর ইতিহাস। যুদ্ধান্তে অনেক রাষ্ট্র যৌথভাবে পর্যালোচনার উদ্যোগ নেয়। অবশেষে বহু বিতর্ক ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে 1948-এর 10 ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংজ্ঞে মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। মানুষের ইতিহাসে যা একটি মাইলস্টোন। প্রয়োগের সমস্যা তবু থেকেই যায় নিদারুণভাবে; বর্তমান পরিস্থিতিকে তাই বড়জোর বলা যায় সমাধানের দীর্ঘপথের প্রাথমিক পদক্ষেপ।

মানবাধিকারের এই বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তিকে মনে রেখে বর্তমান নিবন্ধটি সংগৃহীত হয়েছে জার্মানির 'Universals' (Vol 34, 1992) নামের একটি গবেষণা পত্রিকা থেকে। লেখক অধ্যাপক কিমিনিশ্ আন্তর্জাতিক আইন এবং সাংবিধানিক আইনের একজন সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ। বর্তমান নিবন্ধটিতে মানবাধিকারের প্রয়োগের সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। মানবাধিকার ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের দ্বন্দ্ব এবং পাশাপাশি মানবাধিকার সুরক্ষার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার ইতিহাস এখানে গভীর বিশ্লেষণে অধীত হয়েছে। মূলত, পাশ্চাত্যের প্রেক্ষাপটে আলোচিত হলেও রচনাটির প্রগাঢ় প্রাসঙ্গিকতা আছে সব দেশেই।

প্রারম্ভ থেকেই মানবাধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার পথটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণা বলতে সাধারণত বুঝি সাংবিধানিক রাষ্ট্রের ধারণা, ঈশ্বরবিশ্বাস অথবা সামাজিক সচেতনতা; এগুলি কিন্তু চিরকালই বিভিন্ন ক্ষমতাসালী প্রতিষ্ঠান যেমন বিচারব্যবস্থা, চার্চ অথবা সামাজিক বিধিনিষেধের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে এসেছে। পক্ষান্তরে, মানবাধিকারের ধারণাটি যেন সততই আইনী মারপ্যাঁচ, রাজনীতির সূত্র অথবা প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সক্রিয় চালিকাশক্তির আড়ালেই রয়ে গেছে। তাই মানবাধিকারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ তুলনায় মানবের ইতিহাসে একটি বিলম্বিত অধ্যায়। ওই বিলম্বিত অধ্যায়ে আছে একালের লিখিত সংবিধান; আছে আন্তর্জাতিক আইনের সর্বাধুনিক ধারাগুলি।

রাষ্ট্র, নাকি যন্ত্র ?

ঐতিহাসিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ-প্রসঙ্গে সহমত যে আধুনিক রাষ্ট্রের পরিচয় ক্ষমতার যন্ত্র হিসাবে। রাষ্ট্র তাহলে যন্ত্র! এ হেন তুলনার হেতু ছিল এই যে, যন্ত্রের মতই রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিগুলি সংঘটিত হয় ঘর্ষণশূন্যভাবে, নিয়ন্ত্রিতভাবে এবং পূর্ব-নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে। অনতিবিলম্বেই বোঝা গেল এরকম তুলনার মধ্যে একটি গভীর ভাবার্থ আছে। পরমতন্ত্রের যুগে লালিত ও বিকশিত আধুনিক রাষ্ট্র এই অর্থে যন্ত্র-সদৃশ যে তা মানুষকে বিপুল এক চক্রাকার যন্ত্রের সামান্য একটি দাঁত হিসাবে অবমূল্যায়িত করে।

গ্রীক দর্শন, জার্মান আইন এবং খ্রিস্টধর্মের নির্যাস নিয়ে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গণতন্ত্র হয়ে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল

তা থেকে কিছু ভিন্ন সুপ্রাচীন স্বেচছিত যুগের। রোমান সাম্রাজ্যের সময়েই দাসব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান তার প্রাসঙ্গিকতা প্রায় হারিয়ে বসেছিল। সেটাকেই বলা যায় স্বেচছিতের শেষ সংকেত। এই সময়ের ব্যাপ্তিতেই পূর্ব-ভূমধ্যের মানুষের সময় অতিবাহিত হয়েছে সুদীর্ঘ যন্ত্রণায়।

মধ্য-উনিশ শতক থেকে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের ক্রমবর্ধমান বর্বরতা আমাদের মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা, যেমন সংখ্যালঘুর নির্যাতন, জাতিবৈষম্য, গণবহিষ্কার, উপনিবেশবাদ, গণশোষণ, সংগঠিত জাতি-নিধন, নির্যাতন শিবির ইত্যাদি আমাদের বিশ্বাসকে টলিয়ে দিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি যে আধুনিক রাষ্ট্রকে নিপীড়নের উপাদান যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে এমনকি ফারাও-দের নিষ্ঠুর স্বেচছিতকেও অতিক্রম করে গেছে বহুগুণে— এই অভিমত অস্বীকার করা তাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে নৈরাশ্যবাদের ছায়া তাই সর্বত্র। এরকমটাই ভাবতে হচ্ছে যে মানবাধিকারের ধারণাটি কখনোই রাষ্ট্রের যৌক্তিকতার বিপ্রতীপে অবস্থান করতে পারে না।

কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমানতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই তো মানবাধিকারের ধারণার কেন্দ্রিক বিষয়। পরমতন্ত্রের যুগেও তা সত্য ছিল, এবং আধুনিক রাষ্ট্রে তা আরো বেশি করে সত্য। স্পষ্টতই মানবাধিকারের এই প্রত্যাঘাত স্বেচছিতিক রাষ্ট্রের চেয়ে গণতন্ত্রে অনেক বেশি লক্ষণীয়।

কিন্তু মানবাধিকারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মুখ্য সমস্যা সেটাই। কিভাবে একটি রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা এমন কিছুকে প্রতিষ্ঠানভুক্ত করবে, যা কিনা শেষাবধি সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যাবে? কিভাবে একটি আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থা, যা মূলত সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহেরই আইন ব্যবস্থার নির্যাস, সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমায়িত করে মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ও পরিচালনার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে এবং এইভাবে সার্বভৌমত্বের তাৎপর্যকে হ্রাস করবে যা একদা একান্তই রাষ্ট্রের কর্মসীমানার মধ্যে ছিল তাকে কিভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সীমানায় স্থানান্তর করতে পারবে? প্রারম্ভ থেকেই আন্তর্জাতিক আইন কখনোই জনসাধারণের আইন হয়ে উঠতে পারে নি। বরং তা ছিল রাজ্যেশ্বরদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের আইন এবং অতঃপর হয়ে উঠেছে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের আইন। আজও পর্যন্ত তাই হয়ে রয়েছে। এমনকি আজও আন্তর্জাতিক আইনের সম্পর্ক শুধু সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ, তাদের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং কিছু বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই। আন্তর্জাতিক আইনের স্তরে বৈধ

সত্তা হিসাবে ব্যক্তিমানুষের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকাই নেই।

এটা জলের মতই স্বচ্ছ যে, একজন জাতীয় নাগরিকত্বহীন ব্যক্তি অথবা একজন আন্তর্জাতিক শরণার্থী যাদের কোনো রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা নেই, তারা কি সুকঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। ব্যক্তি মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক আইনগত অবস্থান নিমিত্তির তাবৎ প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থান বলতে কি বুঝি? আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোয় অন্তত একটি ক্ষেত্র যেখানে আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যক্তি মানুষের মধ্যবর্তী হিসাবে সার্বভৌম রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা থাকবে না। ছয় দশক ধরে বেশ কয়েকটি মহান প্রস্তাব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইনের ধারাগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বপক্ষে গ্রহিত হতে পারে, কিন্তু তাদের আইনী রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারে না।

### মানবাধিকারের উভয় সংকট

সামগ্রিকভাবে মানবাধিকারের সংকটের ধরণটি এইরকম : বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রকে তার নাগরিকবৃন্দসহ ব্যক্তিমানুষের প্রতি কতিপয় আচরণবিধিতে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু এই আইন ব্যক্তির নিজস্ব অধিকারের সুরক্ষায় বৈধ সত্তা হিসাবে ব্যক্তির অবস্থানকেই অস্বীকার করে। কিছু বিশেষ প্রস্তাবনার মাধ্যমে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি অবশ্যই আরও কিছু অধিকারের স্বীকৃতি দিতে পারে। 4 নভেম্বর, 1950-এ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি 'মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা'-র সম্মিলনে স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে ঠিক তাই করেছিল। অবশ্য তা কার্যকর হয়েছিল 3 সেপ্টেম্বর, 1953 থেকে।

10 ডিসেম্বর, 1948-এ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রের অনুমোদন করেছিল। মানবিক আবেদনের দৃষ্টিকোণে এটি একটি মহান ব্যাপার। কিন্তু এর কোনো আইনী বাধ্যবাধকতা নেই। বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক আইনে যেহেতু মানবাধিকারের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা নেই। শুধু দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের চুক্তির মাধ্যমেই আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

এ-ধরণের চুক্তির একটি দৃষ্টান্ত রাষ্ট্রসংঘের সনদ, যা 23 জুন, 1945-এ কার্যকর হয়েছিল। কয়েকটি ধারায় এই সনদ মানবাধিকারকে ছুঁয়ে গেছে। এর ভূমিকায় সদস্য রাষ্ট্রবৃন্দ 'মৌলিক মানবাধিকার, ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং পুরুষ-নারীর সাম্যের প্রতি বিশ্বাস'-এর শপথ নিয়েছে। এর অনুচ্ছেদ 1 ধারা 3-এ ব্যক্ত হয়েছে... 'মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার উন্মেষের জন্য আন্তর্জাতিক

সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন।' এখানে থাকবে না কোনো জাতি; লিঙ্গ,ভাষা বা ধর্ম বৈষম্য। রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। অনুচ্ছেদ 13-তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের বৈধকরণের প্রসঙ্গ রয়েছে। এই অনুচ্ছেদে সাধারণ পরিষদকে তার কর্মসূচীর মধ্যে 'জাতি, লিঙ্গ, ভাষা অথবা ধর্ম বৈষম্যের উর্ধ্ব থেকে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সহায়ক' অনুমোদনগুলি এবং অধীত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

অবশ্য সনদের ধারাভাষ্যকারগণ প্রায়শই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের সনদে শুধু সেই সূত্রগুলির ঘোষণাই রয়েছে যেগুলোর কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। ঠিক ঠিক কি করা উচিত এবং মানবাধিকারের বিষয়গুলি ঠিক কি কি তা বিশদভাবে নির্দেশ না করেই সদস্য রাষ্ট্ররা আবছাভাবে রূপায়ণের সুনিশ্চিতকরণে সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই 10 ডিসেম্বর, 1948-এর মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা উল্লেখযোগ্য। এখানে রাষ্ট্রসংঘের সনদের বয়ান অনুযায়ী মানবাধিকারের বিষয়গুলি বিবৃত হয়েছে, সংজ্ঞায়িত হয়েছে। কিন্তু, পূর্বেই বলা হয়েছে— এই ঘোষণায় কোনো বাধ্যবাধকতার ব্যাপার নেই; সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এটি শুধু অনুমোদন মাত্র। এ অনুমোদন মান্য না হলে কোনো শাস্তিরও ব্যবস্থা নেই।

যারা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের দ্রুত হস্তক্ষেপের প্রত্যাশী ছিলেন, তাদের সবার কাছে শুধু একরাশ নিরাশা নিয়ে এসেছে মানবাধিকারের এই বিশ্বজনীন ঘোষণা। অবশ্য এক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে আরো পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে মানবাধিকারের ধারণার প্রবক্তারা উৎসাহিত হয়েছেন। প্রারম্ভ থেকেই এটা স্পষ্ট যে, 'বিশ্বজনীন ঘোষণা' বড়জোর হতে পারে শুধু দীর্ঘ যাত্রাপথের শুরু। সম্ভাব্য বাকি স্তরগুলি যথাক্রমে 1) আরও অনুমোদনের মাধ্যমে নৈতিক চাপসৃষ্টি; 2) বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে আইনী বাধকতা; 3) আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনগুলির হাতে নির্দেশ জারী করার কর্তৃত্ব।

বিশ্বজনীন ঘোষণার আগেই অবশ্য দ্বিতীয় পদক্ষেপের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে 1946 সালেই মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্র নির্মিতের কাজ শুরু হয়েছে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র— দুখানিই 19 ডিসেম্বর, 1966তে স্বাক্ষরিত হয় এবং অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হয়। 35তম সংশোধনীর অনুমোদনের শেষে জমা দেওয়ার তিনমাস পরে এ-দুটি কার্যকর

হয়—শর্তপূরণের দশ বছর আগেই। 150টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে এমনকি মাত্র 35টিও রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার চুক্তির অনুমোদনে সদিচ্ছা প্রকাশ করে নি দশ বছরের মধ্যে। এ-ঘটনায় গভীর ভাবনার অবকাশ থেকে যায়। চুক্তি দুখানি যথাক্রমে জানুয়ারি ও মার্চ, 1976-এ কার্যকর হয়। আজকের হিসাবে (1992), 81টি রাষ্ট্র উল্লিখিত প্রথম চুক্তিটিতে এবং 85টি রাষ্ট্র দ্বিতীয়টিতে সম্মতি দিয়েছে।

### মৈত্রীপূর্ণ সমাধানের সন্ধান

মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে উল্লিখিত রাষ্ট্রসমূহের আইনী বাধ্যবাধকতা রূপায়ণের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ 28 অনুসারে একটি মানবাধিকার কমিটি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নামে এর কর্তৃত্ব এতটাই সীমায়িত হয়েছে যে, একে কর্ম রূপায়ণে সক্ষম কোনো নিয়ন্ত্রক কমিটি হিসাবে ভাবা কষ্টকল্পনা। তথ্যসংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি করা ছাড়া এর মুখ্য কাজ মানবাধিকার অবমাননার অভিযোগের ক্ষেত্রে 'মৈত্রীপূর্ণ সমাধান' এর সূত্র সন্ধান করা। আর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের চুক্তিপত্রের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রতিবেদন ফাইলবদ্ধ করা ছাড়া কোনো কাজ নেই।

কিন্তু শুধু বিশ্বজনীন ঘোষণা এবং দুটি মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের মাপকাঠিতে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার বিচার করা ন্যায়সঙ্গত হবে না। সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রসংঘ শুধু যে পূর্বোল্লিখিত আন্তর্জাতিক শরণার্থীর অধিকারের মতো মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বসূরী জাতি সংঘের (League of Nations) কাজের ধারাবাহিকতা রেখেছে তাই নয়, বহু নতুন উদ্যোগও গ্রহণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, 11 ডিসেম্বর, 1946-এর জাতিনিধনের অপরাধের নিবৃত্তি ও শাস্তির বিষয়ে সম্মিলন; যুদ্ধপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে বিধিগত সীমাবদ্ধতার অপপ্রয়োগ সংক্রান্ত সম্মিলন; এবং সমস্ত রকম জাতি বৈষম্যের অবসানের ঘোষণা। বহুপাক্ষিক চুক্তিগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করলাম।

তদুপরি, রাষ্ট্রসংঘের কয়েকটি পরিষদ ও বিশেষ সংস্থার ক্রিয়াকলাপ ব্যস্তির মানবাধিকারের বিষয়কে ঘিরেই। উদাহরণ—অছি পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ; শরণার্থী সংক্রান্ত হাই কমিশনারের মডেলে মানবাধিকার সংক্রান্ত হাইকমিশনারের ধারণাটি কিছুকাল ধরেই রাষ্ট্রসংঘের ভিতরে ও বাইরে আলোচিত হচ্ছে, কিন্তু এর ব্যবহারিক রূপায়ণ এখনো দূর অস্ত। অন্যকথায়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সুরক্ষা

এখনো রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের চৌকাঠ অতিক্রম করতে পারে নি।

### আইনী বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতি

1975-এ স্বাক্ষরিত আরক্ষা ও সহযোগিতা সংক্রান্ত হেলসিংকি সম্মিলনের (CSCE) চূড়ান্ত ইশতেহারও এই সতাকে বদলাতে পারে নি। এটি কোনো আন্তর্জাতিক আইন চুক্তি নয়; কিছু সংকল্পের ঘোষণা সম্বলিত আন্তর্জাতিক সম্মিলনের চূড়ান্ত ইশতেহার মাত্র। এই ঘোষণার কোনো আইনী বাধ্যবাধকতা নেই। তাই CSCE-র চূড়ান্ত ইশতেহারের অবমাননার জন্য কোনো রাষ্ট্রকে ভর্ৎসনার প্রসঙ্গটি আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বহীন। এক্ষেত্রে আইনভঙ্গের জন্য ভর্ৎসনার কোনো গুরুত্বও নেই; CECS-র চূড়ান্ত ইশতেহার তাই কোনো নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের স্থাপনার কথা চিন্তা করতে পারে নি।

CSCE-র ধারাবাহিক যে সম্মিলনগুলিতে মানবাধিকারের বিষয়গুলি আলোচিত হয়, সেগুলি শুধু আলোচনা-ফোরাম; কখনোই তা বৈধ অর্থে মানবাধিকার সুরক্ষার প্রতিষ্ঠান নয়। এ ধরনের ফোরামের রাজনৈতিক ও নৈতিক মূল্যকে খাটো করে দেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ব্যাপারটির বৈধ অবস্থানকে বুঝতে যেন ভুল না হয়।

সার্বিক আন্তর্জাতিক আইনের বাইরে প্রকৃত অগ্রগতি ঘটিয়েছে মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় সম্মেলন ECHR। এখানে অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এ ব্যবস্থাটি ইউরোপীয় পরিষদের সংগঠনের সাথে অভিন্ন; তদুপরি এখানে মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য বিশেষ কমিটি আছে— যেমন মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কমিশন এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় আদালত। দুর্ভাগ্যবশত, ব্যক্তিমানুষের পক্ষে ট্রাইব্যুনালের নাগাল পাওয়ার যে মূল পরিকল্পনাটি করা হয়েছিল, তা রূপায়িত হতে পারে নি। অবশ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার ব্যক্তিগত অধিকার আছে। যদিও এ অধিকার তখনই প্রায়োজ্য, যখন স্বাক্ষরকারী যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, তারা কমিশনের কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিতে রাজি আছে। আজ পর্যন্ত 21টি স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে 19টি এ-ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে।

কিন্তু অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি তখনই পাওয়া যাবে, যখন স্থানীয়ভাবে প্রতিকারের সব পথ ব্যর্থ হয়েছে। অতএব কমিশনে পৌঁছতে পারা, 'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ/ আসিতে তোমার দ্বারে।'

### প্রত্যক্ষ গ্যারান্টি

মানবাধিকারের প্রত্যক্ষ গ্যারান্টি, অভিযোগ দায়ের ও তৎসংশ্লিষ্ট আইনগত প্রকরণের প্রতিশ্রুতি ব্যবস্থাদির মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা ইউরোপে একটি সুউচ্চ স্তরে উত্তরিত হয়েছে। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, এ উত্তরণ ঘটেছে পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তর অংশে। হয়তো কিছুটা সাফল্য অর্জনের সম্ভূতি এতে আছে, কিন্তু আত্মসম্মতির কোনো অবকাশ নেই। আরও মরমী প্রয়াস শুধু যে প্রত্যক্ষ গ্যারান্টিসহ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি অথবা ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে তাই নয়, বৈধ সুরক্ষার ব্যবস্থারও বিকাশ ঘটাবে। বিশেষত মানবাধিকার সংক্রান্ত আদালতকে ব্যক্তির নাগালে নিয়ে আসবে।

ECHR-এর সম্পূরক একটি সংস্থা হলো 'আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা' (Organisation of American States) স্বাক্ষরিত 'মানবাধিকার সংক্রান্ত আমেরিকান সম্মিলন'। এর প্রতিষ্ঠা 22 নভেম্বর, 1969-এ। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি এর অংশীদার। এখানেও আছে দুটি নিয়ন্ত্রক কমিটি : মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তঃআমেরিকান কমিশন এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তঃআমেরিকান আদালত। শেযোক্তটির কাছে শুধু স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র এবং কমিশন নিজে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। আদালত কার্যকর হয়েছে 1981 থেকে।

সব মিলিয়ে দেখতে গেলে মানবাধিকার সুরক্ষার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ত্রিফালাপের দীর্ঘ ষাট বছরের ইতিহাস আদতে হতাশাপূর্ণ। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দুটি প্রজন্মের দৈর্ঘ্য বিশ্ব ইতিহাসের মাপকাঠিতে মোটেই বেশি নয়। সুদীর্ঘ তিনশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক আইন-ব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব তাকে কি আর রাতারাতি বদল করা যায়? মনে রাখতে হবে যে, এই মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে শান্তিপূর্ণ পথে। এর সমাধানে পৌঁছতে লাগবে অনেক সময়।

যে সময় পৃথিবীর বহু দেশে মানবাধিকারের প্রভূত অবমাননা ঘটে চলেছে, তখন এই ধৈর্যের উপদেশকে যেন পশ্চাদপসরণের আবেদন হিসাবে অপব্যাখ্যা করা না হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে আন্দোলনের যে মহান পর্যায় শুরু হয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক আইনের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা, তা এখনো শেষ হয় নি। এখনো আশা আছে যে, আমাদের সময়েই আন্তর্জাতিক আইন রূপান্তরিত হবে রাষ্ট্রের আইন থেকে মানবতার আইনে।

ভাবানুবাদ □ সত্যবান রায়

# জি. এইচ. হার্ডি আর তাঁর ব্রাদম্যান শ্রেণী

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

হাসপাতালে শুয়ে আছেন রামানুজন। মানে প্রস্ফাত গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন (1887-1920)। তাঁকে দেখতে এসেছেন অধ্যাপক হার্ডি। মানে কেমব্রিজের স্বনামধন্য অধ্যাপক গডফ্রি হ্যারল্ড হার্ডি (1877-1947)। এসেই বললেন, যে-ট্যাক্সিটায় এলুম তার নম্বর 1729। মনে হয় সংখ্যাটা ম্যাড্রমেডে, আর আশা করি অলক্ষুণেও নয়।

রামানুজন বলে উঠলেন, 'না-না, ওটা খুবই মজাদার সংখ্যা। দুটো সংখ্যার ঘনকের যোগফল হিসেবে দুটো আলাদা উপায়ে যত সংখ্যা বলা যায় তার মধ্যে এটি সবচেয়ে ছোটো।'

$$\text{অর্থাৎ, } 1729 = 12^3 + 1^3 = 10^3 + 9^3$$

অবাক হয়ে অধ্যাপক হার্ডি জানতে চাইলেন, 'চতুর্থ ঘাতে এ ধরনের কোনো সংখ্যা তোমার জানা আছে?'

একটু ভেবে রামানুজন বললেন, 'ত এমন কোনো স্পষ্ট নমুনা দেখতে পাচ্ছি না। তবে মনে হয়, এ ধরনের প্রথম সংখ্যাটা নিশ্চয়ই বিরাট বড় হবে।'

ঘটনা তা-ই। সংখ্যাটি হবে ন অঙ্কের

$$635,318,657 = 158^4 + 59^4 = 134^4 + 133^4$$

মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে এমনই গভীর জ্ঞান ছিল রামানুজনের। বলা যায়, প্রতিটি মৌলিক সংখ্যার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল।

উচ্চ গণিতের ছাত্রদের কাছে দুজনের নামই খুব পরিচিত। বিশ্বের গণিতজ্ঞ সমাজের কাছে হার্ডি-ই তুলে ধরেন রামানুজনকে—একথা সকলেরই জানা। রামানুজন-এর জীবনীতে এঁদের সম্পর্কে অনেক কথা লেখা হয়। *রামানুজন : বারোটি বক্তৃতা* বইতে হার্ডিও তা লিখেছেন। এখানে আমরা এক অচেনা হার্ডির কথা বলতে চাই। গণিতজ্ঞ হার্ডি নন, মানুষ হার্ডি।

হার্ডির বাবা-মা স্কুলে পড়াতেন। অর্থসম্বল বা বংশকৌলীন্য কোনোটাই ছিল না। মাত্র দু বছর বয়সেই হার্ডি লক্ষ অবধি সংখ্যা লিখতে পারতেন। তখনই বোঝা গিয়েছিল যে এ ছেলে বড় হয়ে কিছু হবে। একের পর এক বৃত্তি পেয়ে তিনি পৌঁছলেন কেমব্রিজ-এ। সেখানে ট্রিনিটি কলেজের ফেলো হিসেবে তিনি থাকেন 1898 থেকে 1919 অবধি। 1906-এ তাঁকে ঐ কলেজের লেকচারার করা হয়। মাত্র তেতিরিশ বছর বয়সেই

তাঁকে রয়াল সোসাইটি-র ফেলো মনোনীত করা হয়। কিছুদিন তিনি অক্সফোর্ড-এও পড়ান, 1928-এ যান আমেরিকায়, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপরে ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজি-তে। 1931-এ তিনি ফিরে আসেন কেমব্রিজ-এ, বিশুদ্ধ গণিতের প্রফেসর হয়ে। 1900 থেকে আমরণ কাজ করে গেছেন তিনি। প্রায় চারশ গবেষণা নিবন্ধ ও এগারোটি বই-এ তাঁর কীর্তির প্রমাণ রয়েছে। প্রসঙ্গত চলা যায়, 1924 থেকে 1926 তিনি ছিলেন বিজ্ঞানকর্মী সমিতি (Association of Scientific Workers)-র সভাপতি।

এসব খুব বড় কথা নয়। হার্ডি ছাড়াও এমন অনেক প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ পৃথিবীর বহু দেশে দেখা গেছে। হার্ডির বিশেষত্ব এই যে, তিনি এক নির্দিষ্ট জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন একেবারেই নিজের মতো করে, আর তার থেকে কখনও এক চুল নড়েন নি।

কী সেই জীবন দর্শন? তার প্রধান দুটি দিক হলো : যুদ্ধবিরোধিতা আর ঈশ্বরবিরোধিতা। বিশুদ্ধ গণিতের ক্ষেত্রটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন এই কারণেই। গর্ব করে তিনি বলতেন—আমি একেবারেই অব্যাবহারিক লোক, যা করি তা কোনো কাজে লাগে না।

মনে হতে পারে, এ আবার কেমন কথা? অঙ্ক কি শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার জন্য? হার্ডি মনে করতেন, তিনি এমন কিছু করবেন না যেটা যুদ্ধের কাজে লাগানো যায়। ফলে, ক্ষেপণাস্ত্র বা বায়ুগতিবিদ্যা (aerodynamics) সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় তিনি ঢুকতে চাইতেন না—যতই আকর্ষণীয় হোক তার অঙ্কের দিক (এর প্রভাব রামানুজন-এর ওপরেও পড়েছিল)। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁর অবস্থান ছিল ঘোরতর যুদ্ধবিরোধী। শান্তিবাদ প্রচারের জন্যে বাট্রান্ড রাসেল-কে তখন ট্রিনিটি কলেজ-এর অধ্যাপক পদ থেকে সরানোর ব্যবস্থা হয়। রাসেল-এর অনেক সহকর্মীই তার উদ্যোগ নেন। দেশপ্রেম প্রমাণ করার জন্যে অধ্যাপকদের মধ্যে ছড়োছড়ি লেগে যায়। হাতে গোনা যে কজন সেদিন রাসেল-এর পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হার্ডি ছিলেন তাঁদের একজন। সমস্ত ঘটনাটি নিয়ে পরে তিনি একটি চিঠি বই লেখেন।

এই যুদ্ধ বিরোধিতার পেছনে ছিল একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রত্যয়। 'রাজনীতি করা' বলতে চলতি কথায় যা বোঝায় হার্ডি তা কোনোদিনই করেন নি। ইংরেজ রাজনীতিবিদদের তিনি কোনোদিনই পছন্দ করতেন না। তাই জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ লাগার পর তিনি জার্মান বিরোধী হয়ে পড়েন নি।

অল্প ছাড়া তাঁর জীবনে আকর্ষণ ছিল একটিই : ক্রিকেট। নিজেও খেলতেন, খেলা দেখতে যেতেন, সমস্ত খেলার রেকর্ড কঠস্থ ছিল। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেন্স একবার বলেছিলেন, যে মনোযোগ দিয়ে হার্ডি কাগজের খেলার পাতা পড়েন, তার বদলে যদি রোজ ফটকা বাজারের খবর পড়তেন, তবে তাঁর বড়লোক হওয়া কেউ আটকাতে পারত না।

হার্ডি কিন্তু বড়লোক হতে চান নি। তিনি চাইতেন মানুষের সাম্য, সকলের সমৃদ্ধি। ক্রিকেট-পাগল বলে তাঁর কথাবার্তায় তার ছোঁয়া লেগেছিল। সবসেরা মানুষদের তিনি একটি বিশেষ শ্রেণীতে রাখতেন। সেই শ্রেণীর নাম : 'ব্র্যাডম্যান-শ্রেণী' (অনেক দিন পর্যন্ত তিনি বলতেন 'হব্‌স্ শ্রেণী'। 1930-এর দশকে তিনি এক বন্ধুকে লিখলেন : 'যত ব্যাটসম্যান জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে ব্র্যাডম্যান সবার ওপরে—তিনি নিজেই একটি শ্রেণী। আর্কিমিডেস, নিউটন আর গাউস যদি হব্‌স্ শ্রেণীতে থাকেন তাহলে আমায় স্বীকার করতে হবে যে তাঁদের ওপরেও একটা শ্রেণী আছে, যেটা কল্পনা করা আমার পক্ষে কঠিন। এখন থেকে তাঁদের বরং ব্র্যাডম্যান শ্রেণীতে তুলে দেওয়া হোক।')

মানুষের কৃতিত্বের ক্ষেত্র—বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, যে কোনো ব্যাপারে—এই ব্র্যাডম্যান শ্রেণীতে পড়ার মতো দুটি মাত্র মানুষ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন : একজন হলেন লেনিন, অন্যজন আইনস্টাইন। অক্সফোর্ড-এ পড়ানোর সময়ে নিজের ঘরে তিনি রেখেছিলেন লেনিন-এর ছবি। নিজের রাজনৈতিক মত তিনি গোপন করেন নি।

এ তো গেল হার্ডি-র চেতনার একদিক। দ্বিতীয় দিকটি আরও বেশি নজর করার। নিরীশ্বরবাদী হন অনেকেই, কিন্তু সবার সামনে তা জাহির করেন না। এ ব্যাপারেও হার্ডি ছিলেন কটর। স্কুল ছেড়ে বেরনোর আগেই তিনি ধর্ম তথা ঈশ্বরে আস্থা হারিয়ে ছিলেন। তাঁর অনুরাগী, বিজ্ঞানী-ওপন্যাসিক সি.পি. স্নো লিখেছেন, 'তাঁর (হার্ডির) ক্ষেত্রে এটি ছিল কালো-আর সাদার সিদ্ধান্ত, তাঁর মনের অন্য সব ধারণার মতোই শানদার আর পরিষ্কার।'

ট্রিনিটি কলেজে তিনি যখন পড়তে গেলেন, গির্জায় হাজির

হওয়া তখন ছিল বাধ্যতামূলক। হার্ডি সোজা গিয়ে ডিন-কে বললেন, তাঁর পক্ষে গির্জায় ঢোকা সম্ভব নয়। ডিন জানালেন : হার্ডি-কে তাহলে তাঁর মা-বাবাকে সে-কথা লিখতে হবে। হার্ডির মা-বাবা ছিলেন গোঁড়া ধর্মভীরু লোক। ডিন জানতেন, আর হার্ডি তো জানতেনই, যে খবরটা শুনলে তাঁরা খুবই ব্যথা পাবেন। সাপও মরবে। লাঠিও ভাঙবে না— এমন কিছু ব্যবস্থা হয়তো করা যেত। জর্জ ট্রেভেলিয়ন বা ডেসমন্ড ম্যাকার্থি-র মতো বুদ্ধিমান বন্ধুরা হয়তো সে-ব্যাপারে কিছু পরামর্শও দিতে পারতেন। কিন্তু হার্ডি সে-সব কিছুই ভাবলেন না। মা-বাবাকে দুঃখ দেওয়া হবে জেনেও তিনি সরাসরি তাঁদের কাছে চিঠি পাঠালেন। বিবেককে চোখ ঠারা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অধ্যাপক হওয়ার পরেও হার্ডি কখনও কলেজ-সংলগ্ন কোনো উপাসনালয়ের চৌকাঠ মাড়ান নি—এমনকি কোনো মামুলি সভা ( যেমন, মাস্টার-মনোনয়ন) হলেও নয়। তাঁর জন্যে কলেজের আইনে একটি বিশেষ রেহাই-ধারা যোগ করতে হয়েছিল! তাঁর মৃত্যুর পর লন্ডন গণিত সমিতির-র পত্রিকায় তাঁর এক ঘনিষ্ঠ পরিচিত মানুষ লেখেন : ঈশ্বরকে হার্ডি তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু বলে উল্লেখ করতেন।

এ ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা বলা যায়। 1930-এর দশকে লর্ডস-এর মাঠে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। সকালবেলা, ঝলমলে রোদ। একজন ব্যাটসম্যান অভিযোগ করলেন : কোনো কিছু থেকে আলো ঠিকরে এসে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আম্পায়ররা বেরলেন তদন্ত করতে। স্ক্রিন-এর ধারে কাছে কোনো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে? না। কোনো জানলার কাচ? না। শেষে এক আম্পায়র আবিষ্কার করলেন : দর্শকদের মধ্যে একজন পাদ্রি বসে আছেন, তাঁর গলায় ঝোলানো বিরাট ক্রুশ-এ প্রতিফলিত আলো ব্যাটসম্যান-এর চোখে লাগছে। আম্পায়র ভদ্রভাবেই সেই পাদ্রিকে বললেন : গলা থেকে ক্রুশটা খুলে ফেলুন।

দর্শকদের মধ্যে হার্ডি-ও ছিলেন। সমস্ত ঘটনা দেখে তাঁর ভারি ফুর্তি হলো। লাঞ্চ-এর সময়ে না-খায়ে তিনি একটার পর একটা পোস্টকার্ড লিখে চললেন তাঁর পাদ্রি বন্ধুদের উদ্দেশে। ভাবটা যেন : কেমন জন্দ!

জয় অবশ্য সর্বদা একতরফা হতো না। ফেনার্স-এর মাঠে এক প্রশান্ত সন্ধ্যায় গির্জার ঘন্টা বাজতে শুরু করল। হার্ডি বললেন, 'এটাই দুর্ভাগ্য যে আমার জীবনের সবচেয়ে সুখী সময়ের কিছুটা কাটে রোমান ক্যাথলিক গির্জার আওয়াজের মধ্যে।'

[ এরপর 24 পাতায় ]

## ভোজ্য তেল ও ভেজাল

ভারতবাসী তেল খায় পরিমাণে কমই, কিন্তু সামান্য তেলই ভারতের খাদ্য-সংস্কৃতিতে অসামান্য ভূমিকা পালন করে। শুধু রসনা তৃপ্তির জন্য রান্নাতেই নয়, আরও কত বিচিত্র ব্যবহারই না হয় তেল ও তৈলবীজের। পুজোর উপচার, প্রদীপ জ্বালা, ব্যথার মালিশ, আরও কত কি!

কিন্তু বারবার কেন ঘটে একই ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি? 1952-য় পশ্চিমবঙ্গে সরষের তেলে ভেজালের ফলে বহু সংখ্যক মানুষ শাখে তথা বেরিবেরি তথা ড্রপসি আক্রান্ত হয়েছিল, তারপর আবার একটি ঘটনা ঘটে 1971-এ পশ্চিমবঙ্গে (দমদম) ও বিহারে (পাটনা), 1973-এ দিল্লীতে। 1988-তে কলকাতার বেহালায় রেশন দোকানের রেপসীড তেলে ট্রাইফ্রেসাইল ফসফেট নামক বিষ তরল মেশানোর ফলে প্রায় আড়াই হাজার মানুষ নানাভাবে পঙ্গুত্বের শিকার হয়েছিল। যে স্মৃতি এখনও টাটকা, যে দুর্ভাগ্য আজও বইছেন বহু মানুষ।

তারপর প্রায় একদশক কেটে গেছে। হঠাৎই আবার বিস্ফোরণ ঘটল। 5 আগস্ট দিল্লীতে ড্রপসি রোগে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল। তারপর ঘটে চলল আরও আরও মৃত্যু। প্রধান কেন্দ্র দিল্লী—খোদ রাজধানী। 6 সেপ্টেম্বর 'The Statesman'-এর খবরে প্রকাশ মোট 47 জনের মৃত্যু হয়েছে ঐ রোগে, ঐদিনই নতুন করে 67 জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গোটা আগস্ট মাস জুড়ে প্রায় 2300 মানুষ রোগাক্রান্ত হয়েছেন। সম্পূর্ণ অন্ধও হয়ে গেছেন অনেকে।

27 আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত সরষের তেল এবং সমস্ত ধরণের খোলা তেল বিক্রি বন্ধের আদেশ দেয়। দিল্লী, আসাম, বিহার, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম, ত্রিপুরা, কর্ণাটকেও তড়িঘড়ি ঐ আদেশ বলবৎ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীও অনুরূপ ঘোষণা করেন। হঠাৎই তেল অমিল হয়, প্রথম প্রথম এমনকি প্যাকেটের তেলও। হ হ করে চড়ে গেল দাম, সমস্ত রকমের তেলই সিল করা বোতলে বা পলিপ্যাকে আবার পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কমদামী সরষের তেলই এখন সবচেয়ে মহার্ঘ্য—গড়ে 70-80 টাকা প্রতি লিটার।

ভোজ্য তেলের ভালোমন্দ, ভেজাল ইত্যাদি নিয়ে নানা কথাবার্তা শোনা যায় ঠিকই। কিন্তু ক্রেতা হিসেবে আমরা অসহায়। সাধারণ গরীব মানুষ তো আরও বিপন্ন।

এহেন পরিস্থিতিতে আমরা 'বিওবি'-র তরফে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম অধ্যাপক দীপক কুমার ভট্টাচার্যের কাছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভোজ্য তেল ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করে আসছেন। ইন্ডিয়ান অয়েল কমিস্টন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ও সেন্ট্রাল কমিটি ফর ফুড স্ট্যান্ডার্ড (CCFS)-এর অধীন অয়েল অ্যান্ড ফ্যাট সাব-কমিটির বর্তমান সদস্য অধ্যাপক ভট্টাচার্যের কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল বিভিন্ন বিষয়ে—খানিকটা অবিন্যস্ত, খোলামেলা আলোচনা। তার ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন সংঘমিত্রা ব্যানার্জি।

ভারতে ভোজ্য তেলের উৎস কি? ব্যবহারের ধরণ কি?

ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসে খাদ্যাশস্যের পরেই ভোজ্য তেলের স্থান। আর সেই ভোজ্য তেলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে ভোজ্য তেলের বীজ। ভারতে প্রচলিত প্রধান তৈলবীজ ছিট : বাদাম, (Groundnut) রেপসীড-সরষে (Rape-mustard), তিল (Sesame) সয়াবীন, কুসুম (Safflower) আর সূর্যমুখী (Sun flower)। এছাড়া রামতিলের তেল (Niger oil) এবং নারকেল তেল অঞ্চলবিশেষে ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহৃত

হয়।

এইসব তেল উৎস বাদে আরও কিছু অপ্রচলিত তেল বা ফ্যাটের ব্যবহার আছে। ভোজ্য হিসেবে এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 12-15 শতাংশ তৈল সমৃদ্ধ ধানের তুষ (rice bran) তুলাবীজ ও চা-বীজ। কিছু কিছু বৃক্ষজ তৈলবীজ থেকেও তেল পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আছে শাল, মহুয়া, আমের কুঁচি (mango kernel) ইত্যাদি।

উৎপাদিত তেলের প্রায় শতকরা আশি ভাগ ভোজ্য তেল

হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে ধরা যায়, বাকিটা শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ভোজ্য তেলের আবার প্রায় শতকরা আশিভাগ মতো সরাসরি রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয় বাকি অংশটা বিস্কুট, কেক, চকোলেট, বনস্পতি, মার্জারিন ইত্যাদি তৈরিতে যায়।

ভোজ্য তেলের ভালোমন্দ বিচার কিভাবে করা যায়?

ভোজ্য হিসেবে তেলের উপযোগিতা তার পুষ্টি ও খাদ্যগুণের নিরিখেই করতে হয়।

তেল থেকে সরাসরি ক্যালোরি (তাপ) তো পাওয়া যায়ই। তবে আমাদের দেশে তা মোট প্রয়োজনীয় ক্যালোরির মাত্র তিন শতাংশ সরবরাহ করে।

তেল থেকে আমরা পাই এমন কিছু অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড যা আমাদের শরীরে সংশ্লেষিত হয় না এবং সেগুলি সম্পূর্ণভাবেই খাদ্য নির্ভর। ভোজ্য তেল এগুলির যোগান দেয়, তবে বিভিন্ন তেলে এগুলির তারতম্য অনেকটা। কোনো তেলের পুষ্টিমূল্য তাই প্রধানত নির্ভর করে তার মধ্যকার ফ্যাটি অ্যাসিড-গুলির পরিমাণগত ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ওপর।

ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়াও ভোজ্য তেলে জারক প্রতিরোধী

যৌগ (antioxidant) থাকে যা কোলোস্টেরল বা প্রোটিনের জারণ প্রতিহত করে এবং ক্যানসার সৃষ্টির উপাদানকে বার করে দিতে সাহায্য করে। সেগুলিরও উপস্থিতি বিভিন্ন তেলে বিভিন্ন রকম। তবে তুষের তেল ও পাম তেলে বেশ ভালো পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট যৌগ আছে।

যে কোনো একটি তেল থেকে বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সঠিক পরিমাণে পাওয়া দুস্কর। তাই বিভিন্ন তেল মিশিয়ে পাল্টে পাল্টে খাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে 96টি সংস্থাকে মিশ্র ভোজ্য তেল (blended oil) প্রস্তুতির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এদেশে মিশ্র তেল তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। যদিও মিশ্র তেল থেকে তৈরি মাখন বা মার্জারিন এবং খুব কম ফ্যাটযুক্ত ঐ সব জিনিস বেশ ভালোই চলছে।

সরষের তেল কি ভোজ্য হিসেবে গ্রহণীয়? দীর্ঘ ব্যবহারে কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে?

সরষের তেলে অত্যাবশ্যকীয় দুটি PUFA প্রায় সমান অনুপাতে 25 শতাংশ মতো থাকে। সেদিক থেকে এটি যথেষ্ট

---

ভারতে ভোজ্য তেলের উৎপাদন কত? চাহিদা কত? আমদানি? পশ্চিমবঙ্গের ছবিটা কেমন? কি করে তেলের যোগান বাড়ানো সম্ভব?

ভারতে বর্তমানে তৈলবীজের উৎপাদন ধরা যায় বছরে প্রায় 240 লক্ষ টন, যা থেকে বছরে প্রায় 70-72 লক্ষ টন তেল পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া ধানের তুষ এবং তুলাবীজ যথাক্রমে বাৎসরিক প্রায় 6 লক্ষ টন তেলের যোগান দেয়। কয়েকটি বৃক্ষজ তেল-উৎস যেমন শাল, মহুয়া, আমের কুঁচি (Mango Kernel) ইত্যাদি থেকেও আসে এক থেকে দেড় লক্ষ টন তেল। বর্তমানে ভারতে প্রায় 30 হাজার টন পাম তেলও উৎপাদিত হচ্ছে মূলত অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক ও আন্দামান নিকোবরের অয়েল পাম (Oil Palm) চাষ থেকে। 1977 নাগাদ অয়েল পাম চাষের জন্য অয়েল পাম ইন্ডিয়া লি. [Oil Palm (India) Ltd] প্রতিষ্ঠিত হয় একটি হোল্ডিং কোম্পানি হিসেবে। আশা করা যায় আগামী পাঁচবছরের মধ্যে দেশে বছরে এক লক্ষ টন পাম তেল উৎপাদন করা যাবে।

মাথাপিছু বছরে আট কেজি চাহিদা ধরলে এবং দেশের মোট জনসংখ্যা একশো কোটি ধরে নিয়ে বলা যায় বর্তমানে ভোজ্য তেলের বার্ষিক চাহিদা প্রায় আশি লক্ষ টন। কাজেই মোটামুটি বলা যায়, উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা প্রায় 10 লক্ষ টন বেশি। এই ঘাটতি অংশ বিদেশ থেকে আমদানির প্রয়োজন পড়ে।

একই বিচারে পশ্চিমবঙ্গে ভোজ্য তেলের বাৎসরিক চাহিদা প্রায় 5 লক্ষ টন। কিন্তু রাজ্যে উৎপাদিত হয় প্রায় এক লক্ষ টন সরষের তেল, 50 হাজার টন তিল তেল এবং 30 হাজার টন মতো ধানের তুষের তেল। কাজেই চাহিদার বেশির ভাগটাই পূরণ করতে হয় বিদেশ থেকে আমদানি বা অন্য রাজ্য থেকে (প্রাধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান) তেল বা তৈলবীজ সরবরাহের মাধ্যমে।

তৈলবীজের উৎপাদন বাড়িয়ে ভোজ্যতেলের যোগান অনেকটা বাড়ানো যেতে পারে অল্পায়াসে। তুষের তেলের উৎপাদন একটু চেষ্টা করলেই দুলাখ টন পর্যন্ত করা যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের চা বীজ থেকেও উপজাত হিসেবে তেল পাওয়া যেতে পারে। তুলাবীজের তেলও আরও বাড়তি উৎপাদন করা সম্ভব। এই তিনটি উপজাত তেল (ধান, চা ও তুলা প্রধান উৎপাদন) ভোজ্য হিসেবে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য।

পুষ্টিগুণসম্পন্ন। কিন্তু সরষের তেলে এরুসিক অ্যাসিড (Eru-  
cic acid) নামের একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল অ্যাসিড আছে যা মানুষের  
পক্ষে উপকারী নয়। এছাড়াও সরষের তেলের চারিত্রিক যে  
ঝাঁঝ তা অ্যালাইল আইসোথায়োসায়ানেট ( Allyl  
Isothiocyanate) নামক একটি গন্ধকযুক্ত যৌগের উপস্থিতির  
কারণে এবং এটিও মানবশরীরে থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যার জন্ম  
দিতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সেজন্য সরষের তেলকে  
'বিষতেল' হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে মাথাপিছু তেলের ব্যবহার এতই কম  
(গড়ে 20-25 কেজির জায়গায় মাত্র 3-8 কেজি, বছরে) যে,  
সরষের তেল থেকে বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তিত হবার মতো  
কিছু নেই। বছর দশ বারো আগেও এদেশের নামকরা হৃদরোগ  
বিশেষজ্ঞরা বলতেন যে সরষের তেল থেকে হার্টল্লক বাড়ছে,  
কিন্তু এই সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাছাড়া  
আমাদের দেশে বহু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সরষে ও তার তেল  
ব্যবহারে অভ্যস্ত। তেলের পুষ্টি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই আমাদের  
জানা হয়ে গেছে এমনও দাবি করা যায় না। তবুও সরষের তেল  
সম্পর্কে আশঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই এটা জোর দিয়েই  
বলা যায়। তবে এতে শিয়ালকাঁটার তেলের ভেজাল যাতে  
কোনোভাবেই না থাকে সেদিকে সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ভোজ্য তেলে ভেজাল দেওয়া কি নিয়মিত ঘটনা? কি কি  
ভেজাল দেওয়া হয় তেলে?

স্বাধীনতোত্তর সময়ে আমরা সর্বক্ষেত্রেই মানুষের মান ও  
মানসিকতার যে ক্রমবনতি দেখছি, তেলের এই মারাত্মক এবং  
ভয়াবহ ভেজালকে তারই একটা অংশ বলে ভেবে নেওয়া  
যেতেই পারে। তবে উৎপাদনের যে ঘটতি রয়েছে সেটা ভেজাল  
দেবার প্রবণতাকে আরো জোরদার করেছে একথাও অনস্বীকার্য।

সরষের তেল, বাদাম তেল, তিল তেল, কুসুম তেল,  
নারকেল তেল ইত্যাদি বিভিন্ন পরিচিত ভোজ্য তেলে সাধারণত  
'ভেজাল' দেওয়া হয় আমদানি করা ভোজ্য তেল যা বাজারে  
বিক্রি হবার কথা অনেক সম্ভায়। সহজলভ্য সস্তার স্থানীয়  
তেলেরও ভেজাল হিসেবে ব্যবহার আছে। এপর্যন্ত তবুও  
একরকম। কিন্তু সমস্যা গুরুতর হয়ে পড়ে তখনই যখন মনুষ্য  
ব্যবহারের অনুপযোগী কিছু তেল যেমন শিয়ালকাঁটার তেল,  
ক্যাস্টার অয়েল, লিনসিড (তিসি) অয়েল অথবা খনিজ তেলকে  
ভেজাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বনস্পতিতে (Hydroge-  
nated Vegetable oil) ভেজাল দেওয়া হয়েছে গরুর চর্বি  
অথবা বিভিন্ন জন্তুর ফ্যাট এমন ঘটনাও ঘটে। এছাড়াও দ্রাবক  
দ্বারা নিষ্কাশিত তেলে পলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন  
(PAH), ট্রাইফ্রেসাইল ফসফেট, লুব্রিকেটিং তেল বা ডিজেল

### মুফা (MUFA) ও পুফা (PUFA)

তেল বা ফ্যাটের মূল রাসায়নিক উপাদান হল কার্বন পরমাণুর দীর্ঘ শৃঙ্খল যুক্ত কয়েক প্রকার অ্যাসিড (ফ্যাটি অ্যাসিড) ও  
গ্লিসারিনের বিভিন্ন সম্মিলিত যৌগ। ভোজ্য তেলের ফ্যাটি অ্যাসিড মূলত দু-রকমের—সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ; শেষোক্তটিকে  
আবার প্রধান দুটি ভাগে ফেলা যায়—একটি অসম্পূর্ণতা যুক্ত অ্যাসিড (Mono Unsaturated Fatty Acid, MUFA)  
এবং একাধিক অসম্পূর্ণতা যুক্ত অ্যাসিড (Poly Unsaturated Fatty Acid, PUFA)। এদের মধ্যে আবার পুফা  
(PUFA) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুটি বিশেষ PUFA—লিনোলেইক ও লিনোলেনিক (Linoleic & Linolenic)  
অ্যাসিড পুষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় (essential) কারণ এগুলি খাদ্যের মাধ্যমেই পাওয়া যায়, শরীরে তৈরি হয় না।  
এই দুটি ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে বিপাকীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে অপর তিনটি PUFA তে পরিণত হয়, যা শরীরের কোষকলাদির  
গঠন ও ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করে।

বিভিন্ন তেলে তিনপ্রকার ফ্যাটি অ্যাসিডের—সম্পূর্ণ ও দুধরণের অসম্পূর্ণ—তুলনামূলক পরিমাণ বিভিন্ন এবং এ দিয়েই  
ভোজ্য তেলের প্রাথমিক গুণবিচার করা যায়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, নারকেল, সরষে, পাম ও বাদাম তেলে  
PUFA তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু সয়াবীন, সূর্যমুখী ও কুসুম তেলে এটা বেশি পরিমাণে থাকে। ধানের তুষের তেলে কিন্তু  
তিন প্রকার অ্যাসিডের অনুপাত প্রায় সমান। ভোজ্য তেলে অতিরিক্ত পরিমাণ সম্পূর্ণ ফ্যাটি অ্যাসিডের কারণে কোলেস্টেরল  
সমস্যা বৃদ্ধি পেয়ে হার্টের ব্যামোর কারণ হতে পারে। আবার PUFA-র অতিরিক্ততা ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ায়। ফ্যাটি  
অ্যাসিডের সূচম বস্তুনের বিচারেই শুধু নয়, ধানের তুষের তেলে কয়েকপ্রকার অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট যেমন টোকোফেরল  
(tocopherol) ওরাইজানল (oryzanol), টোকোট্রাইএনল (tocotrienol) ইত্যাদি থাকে। তাই ভোজ্য হিসেবে তুষের  
তেলের গ্রহণযোগ্যতা খুব বেশি বলা যায়।

ও তার বিভিন্ন উপাদান ভেজাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের ভেজাল মানুষের পক্ষে মারাত্মক শারীরিক ক্ষতির এবং ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শিয়ালকাঁটার বীজ কি চাষীর অসাধনতায় সরষের সঙ্গে মিশে যেতে পারে? সরষের তেলে কি পরিমাণ এই তেল মেশালে তা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে? কতদিন ধরে খেলে? সরষের ক্ষেত্রে শিয়ালকাঁটার বাড়বাড়ন্ত নেহাতই আগাছা হিসাবে এবং এদের বেড়ে ওঠার সময়ও আলাদা, তফাৎটা প্রায় দুমাসের। কালো সরষের বীজের সঙ্গে এদের আকারগত সাদৃশ্যের কারণে এটা ভেজাল হিসাবে অত্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবেই মেশানো হয় একথা মেনে নিতেই হবে। মোটামুটি শতকরা 0.2 থেকে 0.5 ভাগ শিয়ালকাঁটার তেল থাকলেই সেটা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক। কতদিন ব্যবহারে বিপদ ঘনিয়ে উঠবে তা অবশ্য বলা কঠিন। একদিন ব্যবহারও মারাত্মক হতে পারে।

উৎপাদক এবং ক্রেতার মাঝে অনেকক্ষেত্রেই অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়। সুতরাং কেবল উৎপাদকই নয়, মাঝের ঐ স্তরগুলির মধ্যে যে কোনোটিতেই তেলে ভেজাল মেশানো হতে পারে।

ভোজ্য তেলের গুণমান পরীক্ষা করার কোনো সরকারি ব্যবস্থা আছে কি? কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত জিনের তৈলবীজের (transgenic seeds) তেল কি ভারতে অনুমোদিত?

ভোজ্য তেলের মান নির্দিষ্ট হয়েছে বিধিসম্মত সংশ্লিষ্ট আইন Prevention of Food Adulteration Act (PFA Act) -এ। ফ্যাট ও তেলে ভেজাল এবং দূষণের সঠিক নির্দেশের জন্য Standard sampling পদ্ধতির প্রতি বিশ্বস্ততার গুরুত্ব অসীম। International Organization for Standardization-এর ISO : 5555 প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ তেল বা ফ্যাটের নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছে।

প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী সরকারি খাদ্য পরিদর্শকরা

*শিয়ালকাঁটার বীজের তেল কেন বিপজ্জনক?*

শিয়ালকাঁটার বীজের তেলে দুটি প্রধান উপক্ষার (alkaloid) থাকে—স্যাংগুয়ানারিন (Sanguanarine) এবং ডাইহাইড্রোস্যাংগুয়ানারিন (Dihydrosanguanarine) যা ধমনীতে জমা হয়ে ভিটামিন-বি সংশ্লেষণে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে ড্রপসি এবং গ্লুকোমা দেখা দেয়। সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

প্রয়োজনে তেলের নমুনা সংগ্রহ করে বিভিন্ন সরকারি ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করাতে পারেন এবং ভেজাল ধরা পড়লে মামলাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে নানা কারণে বহু ফাঁকফোকর সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সরষের তেল সহ সমস্ত তেলের সিল করা প্যাকেট বিক্রি বাধ্যতামূলক করেছে। এই আদেশ অনুযায়ী ভোজ্য তেলের প্যাকেট প্রস্তুতকারকদের (Packers) 15 ডিসেম্বর 98-এর মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং প্যাকেটে তেলের ওজন ও মান নির্দেশক ঘোষণা করতে হবে। সরষের তেলের প্যাকেট লিখিত ঘোষণা থাকতে হবে যে, তেলটি শিয়ালকাঁটার তেল থেকে মুক্ত। জিন পরিবর্তিত ও তা থেকে নিষ্কাশিত তেলের ব্যাপারেও বিশেষ চিন্তাভাবনা এবং পৃথক অনুমোদন অবশ্যই প্রয়োজন।

সাধারণ ক্রেতার কি সন্দেহ হলে কোনো তেলের পরীক্ষা করতে পারেন?

হ্যাঁ সাধারণ ক্রেতারও ভোজ্য তেল সম্পর্কে নানাভাবে সতর্ক হতে পারেন।

A. অস্বাভাবিক কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ক্রেতারও স্থানীয় পুরসভা, আগমার্ক ল্যাবরেটরি, BIS ল্যাবরেটরি এবং সরকারি পরিদর্শকদের সহায়তায় ভোজ্য তেলের মান বিষয়ক যে কোনো সন্দেহ মিটিয়ে নিতে পারেন।

B. রেজিস্ট্রিকৃত স্থানীয় বিজ্ঞান সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় ফুড ল্যাবরেটরি থেকে প্রাপ্ত ভেজাল কিট-এর সাহায্যে তেলে উপস্থিত ভেজাল বা দূষণ সনাক্তকরণ করতে পারেন।

C. ক্রেতা নিজেই অথবা স্কুল কলেজ বা সায়েন্স ক্লাব ইত্যাদির সহায়তায় নিম্নলিখিত কয়েকটি সরল এবং দ্রুত কিন্তু সুবেদী পরীক্ষার মাধ্যমে তেলে ভেজাল চিহ্নিত করতে পারেন।

1. শিয়ালকাঁটা মেশানো তেলে সমপরিমাণ ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে মিনিট দশেক অপেক্ষা করলে দুটি স্তর দেখা যাবে। তলার স্তর কমলা হলে শিয়ালকাঁটার তেলের উপস্থিতি সন্দেহে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

2. এক মিলি মতো তেলে 10 মিলি মতো অ্যালকোহলে দ্রবীভূত পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড (0.5N) মিশিয়ে উত্তপ্ত করতে হবে। এর পরে মিশ্রণে বিস্কন্ধ জল মিশিয়ে ফোঁটালে যদি পরিষ্কার (স্বচ্ছ) থাকে তবে ধরে ধরা যায় যে, তেলে ভেজাল নেই, ষোলাটে হলে খনিজ তেলের উপস্থিতি সন্দেহে সচেতন হতে হবে।

3. অতিবেগুনী আলোর নীচে স্বয়ংপ্রভা দেখা গেলে ভোজ্য তেলে ক্যাস্টর অয়েল অথবা খনিজ তেল মেশানো হয়েছে

## ভোজ্য তেলের ভোজবাজি, হাতের কারসাজি কাদের?

অক্টোবর 1998-এ দিল্লীর *নবদান্য (Navdanya)* প্রকাশিত এবং ড. বন্দনা শিবা লিখিত 'মাস্টার্ড না সয়া?' ('Mustard or Soya?') শীর্ষক একটি ইংরেজী পুস্তিকা ভারতে ভোজ্য তেলের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি নিয়ে গুরুতর নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

ড. শিবা এই পুস্তিকায় দেখাতে চেয়েছেন যে সরষের তেলের সাম্প্রতিক ভেজাল ও তার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি আসলে একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। পরিকল্পিত গণহত্যার মাধ্যমে ভারতের ভোজ্য তেলের বাজারকে বিশেষ ধরনের আমদানি নির্ভর করে তোলার প্রক্রিয়ার একটি অধ্যায়।

ভারতের ভোজ্য তেলের অনেকগুলি উৎস এবং এক এক অঞ্চলে এক একটির প্রাধান্য। স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলি শতকরা আশিভাগ ভোজ্য তেলের জোগান দেয়। কিন্তু এক ধাক্কায় সেগুলির ওপর মুত্যু পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে।

রাজস্থান অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন সি. বি. আই. দ্বারা তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে। 'বিহার রাজ গ্রামীণ তৈল উদ্যোগ সংঘ' জানিয়েছে ক্ষুদ্র তৈল শিল্পে নিযুক্ত 11000 কর্মী জীবিকাচ্যুত হয়ে গেছে।

কিন্তু কেন এই ষড়যন্ত্র? একটু পিছন ও আশপাশ থেকে দেখা দরকার। মে-মাসে (11 মে '98) ভারত পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকা ভারতের ওপর বাণিজ্য সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু কৃষি-সামগ্রী রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলেও নেয় অচিরেই।

জুলাই মাসে ভারত দশ লক্ষ টন সয়াবীন তৈলবীজ আমদানির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে (তখন এটা ছিল নিয়ন্ত্রিত আমদানির তালিকভুক্ত)। এবং আগস্ট মাসে দিল্লীতে ভেজাল তেল খেয়ে অনেকগুলি মুত্যুর পটভূমিতে কেন্দ্রীয় সরকার সয়াবীন তৈলবীজের অবাধ আমদানির নীতি গ্রহণ করে এবং এটিকে ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের (OGL) তালিকায় নিয়ে আসে। একই দিনে (27 আগস্ট '98) সরকার সমস্ত রকম সরষের তেল এবং খোলা অবস্থায় অন্যান্য তেল বিক্রির ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

দিল্লীতে উদ্ঘাটিত এবারের ভেজাল-মুত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা, অতীতের অনুরূপ সমস্ত ঘটনার থেকে পৃথক চরিত্রের। একে তো ভেজাল তেলের কারণে এতগুলি মুত্যু নজিরবিহীন, তার ওপর এটা ঘটল ঠিক তখনই, যখন সরকার সয়াবীনের তৈলবীজ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অন্যান্যবারের মতো রাজধানী থেকে দূরে না ঘটে এটা ঘটল খোদ দিল্লীতে, যাতে দ্রুত এবং সহজে তা দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে এবং আতঙ্ক ছড়ায়। আর্জিমোন মেক্সিকানা অর্থাৎ শিয়ালকাঁটা নামক আগাছার বীজের তেল সরষের তেলে ভেজাল দেবার বা মেশাবার একটা পটভূমি বহু আগে থেকেই তৈরি থাকায় স্বাভাবিক কারণেই সরষের তেলের ওপরেই কোপটা এসে পড়ল সব থেকে বেশি। আর তাই হয়তো লক্ষ্য ছিল, কেননা দেশী তৈলবীজের মধ্যে সরষেই প্রধান। .....অতীতে এধরনের ভেজালের ক্ষেত্রে শিয়ালকাঁটার তেলের

### ভোজ্য তেল ও ভেজাল : বারের পাতার পর

ধরা যায়।

4. তেল যদি খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় তাহলে ধরা যায় যে তিসির তেল ভেজাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। (তিসির তেল ভোজ্য নয়)।

5. যে কোনো দ্রাবকে তেল নিয়ে তাতে ফোঁটা ফোঁটা ব্রোমিন মেশালে যদি তলানি পড়া পরিষ্কার দেখা যায় তবে তিসির তেলের উপস্থিতি নিশ্চিত।

6. সরষের তেলের প্রতিসরাঙ্ক 1.470 থেকে 1.474। সরষের তেলে ক্যাস্টর অয়েল বা লিনসীড অয়েল ভেজাল হিসাবে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিসরাঙ্ক বদলে যাবে।

7. রিফাইন্ড ভোজ্য তেলে দ্বিগুণ পরিমাণ অ্যালকোহল মিশিয়ে

ঝাঁকিয়ে যথেষ্ট সময় রেখে দিলে অ্যালকোহল এবং তেলের দুটি পরিষ্কার স্তর দেখা যাবে। অ্যালকোহলের স্তরটিকে পৃথক করে বাষ্পীভবন করলে যদি তবুও তেল অবশিষ্ট থাকে তবে ক্যাস্টর অয়েল ভেজাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ধরে নিতে হবে, কারণ ক্যাস্টর অয়েল অ্যালকোহলে দ্রবীভূত হয়, ভোজ্য তেল হয় না।

8. তামার সরু পাতকে তেলে ডুবিয়ে মিনিট দশেক রাখার পর যদি পাত এর ওপর কালো (কপার সালফাইড)-এর স্তর পড়ে সেক্ষেত্রে ভোজ্য তেলে (সরষের তেল বাদে) গন্ধক দূষণ হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : দেবাশিস গুপ্ত

পরিমাণ শতকরা একভাগের বেশি দেখা যায় নি এবং রোগটা, মোটের ওপর, ফোলা পায়ের মধ্যেই সীমিত থাকত। কিন্তু এবার শিয়ালকাটার বীজের তেল দশ থেকে তিরিশ শতাংশ ভেজাল দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে মেশানো হয়েছে ডিজেল ও শিল্প ব্যবহৃত অন্যান্য তেল যাতে বিষক্রিয়া আরও তীব্র হয়েছে। রোগাক্রান্ত মানুষের শুধু পা-ই ফোলে নি, লিভার কিডনি হার্টেও বিষ ছড়িয়েছে। ফুসফুসে তরল জমে গিয়ে শ্বাসকষ্টে মারা গেছেন বহু মানুষ, এবং অন্ধও হয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছাড়া এমনটা ঘটা প্রায় অসম্ভব।

এই ষড়যন্ত্রের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য সরষের তেলকে বাজার থেকে হটানো। পূর্ব ও উত্তরভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রজাতির সরষে বা রাই শুধু যে তেলের উৎস হিসেবেই অত্যন্ত প্রিয় তা নয়, মানুষের জীবন-সংস্কৃতিতেও অন্যান্য নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এই বীজগুলি।

সারা ভারতে 13,31,600টি ঘানি ও 20,000টি ছোট ছোট মিলে স্থানীয় সরষের বীজ থেকে স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেই ভারতের মোট ভোজ্যতেলের 64 শতাংশ উৎপাদিত হয়। এই তেলে সমস্ত স্বাভাবিক গুণ ও গন্ধ বজায় থাকে। তেল মানুষের ভোজ্য; আর গবাদি পশুর ভোজ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় খোল। বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বন্টনের মাধ্যমে এটা ভারতের খাদ্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের গণতন্ত্রের ধারকবাহকও বটে।

পঞ্চাত্তরে সয়াবীন তৈলবীজ হিসেবে নিতান্তই অর্বাচীন। যাটের দশকে এটি আমদানি হয় এদেশে, যদিও ইতিমধ্যেই তৈলবীজ হিসেবে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। কিন্তু এতে সরষের তুলনায় তেলের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক (40 শতাংশ বনাম 18 শতাংশ) এবং এ থেকে তৈল নিষ্কাশিত হয় হেক্সেন জাতীয় তরল হাইড্রোকার্বন দ্রাবক দ্বারা, বৃহৎ পুঁজির বৃহৎ কারখানায়। এর খোল প্রধানত রপ্তানি হয় ইউরোপে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য। PUFA সমৃদ্ধ বলে সয়া তেলের প্রভূত গুণগান করা হলেও, পরিপক্ক সয়া বীজে যে নানারকম বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ আছে তা সাধারণত অনুস্মিতই থাকে। লেকটিন, ফাইটিক অ্যাসিড, ফাইটোএস্ট্রোজেন ছাড়াও এতে আছে প্রোটিন পরিপাকের জন্য জরুরি এনজাইমের ক্রিয়াকলাপে বিঘ্নসৃষ্টিকারী রাসায়নিক।

সয়াবীনের প্রধান উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ হলো আমেরিকা। বীজ থেকে চাষ, সংরক্ষণ থেকে পরিবহণ, তেল নিষ্কাশন সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় ছটি বৃহৎ বহুজাতিক দ্বারা। বিভিন্ন দেশের আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারও

এদের নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে নয়। ....বিগত মাত্র তিন চার বছরে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত জিনের সয়াবীনের (genetically engineered soyabean) চাষ শূন্য থেকে বিস্তৃত হয়েছে 180 লক্ষ হেক্টর জমিতে। কারগিল, ইউনিলিভার ইত্যাদির বীজ কারবার আত্মসাৎ করে মনসান্টো (Monsanto) এখন এই নয়া সয়াবীনের প্রধান, প্রায় একমাত্র নিয়ন্ত্রা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

Agracetus Corporation নামক বহুজাতিক সংস্থা ইউরোপীয় পেটেন্ট অফিস থেকে সয়াবীনের জিন-নিয়ন্ত্রিত সমস্ত প্রজাতির ওপর পেটেন্ট পায় 1994 সালে। মনসান্টো এর প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু পরে Agracetus-কে কিনে নিয়ে সে প্রতিবাদ তুলে নিয়েছে। কাজেই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত জিনের (transgenic) সয়াবীনের বীজের পেটেন্ট এখন মনসান্টোর ঝুলিতে। এই পেটেন্টের বিরুদ্ধে অবশ্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে RAFI নামক একটি জনস্বার্থবাহী স্বেচ্ছাসেবী (আমেরিকান) সংস্থা। ইটালির রোমে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর জেনারেল ড. জিওফ্রে হটিন এ-ধরণের পেটেন্টের বিরুদ্ধে বলেন—‘কলমের এক আঁচড়ে অসংখ্য কৃষক ও বিজ্ঞানীর গবেষণা ও কাজকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে।’

মনসান্টো নিজেই আবার রাউন্ড-আপ (Round up) ব্র্যান্ডনামের গ্লাইফসফেট আগাছানাশকের পেটেন্টের অধিকারী এবং এই আগাছানাশক প্রতিরোধী নানা কৃত্রিমবীজের পেটেন্টও তাদের দখলে। এই সব নিয়ন্ত্রিত জিনের বীজের মধ্যে আছে ধান, গম, ভুট্টা, আলু, তুলা, সয়াবীন, সূর্যমুখী, রেপসীড, আপেল, আঙুর ইত্যাদি শস্য, তৈলবীজ, ফল ইত্যাদি। সয়াবীনের ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে তিনটি বিভিন্ন উৎসের জিনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাউন্ড-আপ-রেডি-সয়া (Round up Ready soya) বা (RRS) ট্রেডনামের যে তৈলবীজের পেটেন্ট তারা নিয়েছে, তা প্রকৃতিতে কখনও নিজে থেকে তৈরি হয় নি; হতে পারত না। তাদের নিজেদের আগাছানাশক রাউন্ড আপে এই বীজের চারা বা গাছের কোনো ক্ষতি হবে না। ....পরবর্তী ধাপে তারা আরও এগিয়ে পেটেন্ট নিয়েছে এমন সয়াবীনের (কৃত্রিমভাবে জিন নিয়ন্ত্রিত অবশ্যই) পরিপক্কতা পাবার সময়েই যাতে যুক্ত হবে এমন এক বিষ পদার্থ যার প্রভাবে ঐ বীজ অঙ্কুরোদগমের ধর্ম হারাবে। এই কৃৎকৌশলকেই বলা হচ্ছে টার্মিনেটর টেকনোলজি (Terminator technology)। এরকম বীজ ব্যবহার করলে চাষী তার বংশপরম্পরাগত অধিকার—উৎপন্ন ফসলকে বীজ হিসেবে ব্যবহার করার অধিকার হারাবে। বারবার তাকে

মনসান্তোর মতো কারবারীর দ্বারস্থ হতে হবে বীজের জন্য; তারই কাছে যেতে হবে আগাছানাশকের জন্য। এইভাবেই মনসান্তো বীজ-চার-চাষ এবং বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়ম করতে এগিয়েছে। ভারতের ওপর তার শ্যেণ দৃষ্টি।

আমদানিকৃত সয়াবীন তৈলবীজ পুরো বা আংশিকভাবে টার্মিনেটর জিনযুক্ত হতেই পারে। এরকম বীজ থেকে চাষ হলেও নতুন বীজে শুধু যে অঙ্কুরোদগম ধর্ম লুপ্ত হবে তাই নয়, কীট পতঙ্গাদির দ্বারা পরাগসংযোগের মাধ্যমে এই জিন আশে পাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শস্য-ফলাদিতে ব্যাপ্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল। আমরাও বাধ্য হব এই বিষ-পদার্থসহ সেগুলি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে।

টার্মিনেটর টেকনোলজি পৃথিবীব্যাপী বিক্ষোভের সম্মুখীন। মনসান্তো এখন বলছে, বাস্তবে এমন কোনো কারিগরি আজও তাদের হাতে নেই। তারা দাবি করছে এটা নিছকই একটি ভবিষ্যনির্দেশক (Prophetic) পেটেন্ট। কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন আইডিয়ার তো পেটেন্ট হয় না; পেটেন্ট দেওয়া হয় প্রমাণিত কারিগরির ভিত্তিতে। প্রসঙ্গত এও উল্লেখ্য যে, ক্যালজিন (Calgene) নামক বহুজাতিক কোম্পানি কৃত্রিম জিনযুক্ত ভারতীয় সরষে জাতীয় বীজেরও (Indian brassica) পেটেন্ট নিয়েছে। মনসান্তো এখন ক্যালজিনেরও মালিক।

পৃথিবীব্যাপী তাই মনসান্তোর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে—তারা প্রাকৃতিক জৈববৈচিত্র্য ধ্বংস করতে উদ্যত, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অপপ্রয়োগের মাধ্যমে তারা মানুষের খাদ্য ও শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাণিজ্যের ভূবনীকরণের দাবিদার; স্থানীয় বৈচিত্র্য ও বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাকে নষ্ট করে কেন্দ্রীভূত ও কুক্ষিগত করতে চায়। গোটা পৃথিবীর পক্ষেই এই উদ্যোগ ঘোর অমঙ্গলের। আমাদের খাদ্য-সংস্কৃতি, জৈববৈচিত্র্য ধ্বংস কি করে আমাদের স্বয়ম্ভরতা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে কি আমরা এদেরই তোয়াজ করব?

সূত্র : 'Mustard or Soya : The Future of India's Edible Oil Culture', Dr. Vandana Shiva, *Navdanya* (Oct. 1998); A-60, Hauz Khas, New Delhi 110016. India.

## সংযোজন

□ *The Statesman* (6.9.98) ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (NDDB) এবং ফোরাম ফর বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি (FBFS) ভারতে উৎপাদিত তেলে বিষাক্ত ভেজাল মেশানোয় বিদেশী হাতের সন্দেহ করছে যাতে ক্রেতাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি (panic) করা যায় এবং

সরষের তেলের ঝিকম্ভ আমদানিতে সরকারকে বাধ্য করা যায়।

□ *বেঙ্গল অয়েল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের* বিজ্ঞপ্তি (আ. বা. প. 28.11.98) : সরষে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে, সরকার সরষের দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে সরষের তেলের দাম বেঁধে দিচ্ছে এবং তা বজায় রাখতে 'অনুরোধ ও চাপ' দিচ্ছে। 'রাজ্যের 1000 তেল মিলের বহু বন্ধ হয়ে গেছে, বাকিরাও বন্ধ হবে।' 'রাজ্যের দেড়শো বছরের ঐতিহ্যবাহী তেলকল শিল্প ও বাজলির প্রিয় সরষের তেলকে এইভাবে অবলুপ্তির পথে ঠেলে দেওয়ার পিছনে রিফাইন্ড তেলের কারবারী বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থ জড়িয়ে থাকার আশঙ্কা রয়েছে, এতে ইক্ষন জোগাচ্ছে কারা?'

□ কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দ্য স্টেটসমানে* মনসান্তো সম্প্রতি পরপর কয়েকদিন (8-11 ডিসেম্বর '98) 'জনস্বার্থে' বিবৃতি প্রকাশ করে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে তাদের সম্পর্কে 'অপপ্রচারের' বিপরীতে 'সঠিক তথ্য' জানাবার প্রয়াস পেয়েছে। তারা বলছে বায়োটেকনোলজির বিরোধীরা যাকে 'টার্মিনেটর টেকনোলজি' নামে চালাচ্ছে তা আসলে একটি 'জিন সুরক্ষার টেকনোলজি'। ডেন্টা পাইন ল্যান্ড (কোম্পানি) এবং আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার যুগ্মভাবে এই কারিগরির উদ্ভাবন করেছে ও পেটেন্ট নিয়েছে। এই পেটেন্ট সম্পূর্ণ ধারণাগত (conceptual) এবং বাস্তবে এখনই এর কোনো অস্তিত্ব নেই। বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর করতে হলে বছরবছর বছরবছর গবেষণা করতে হবে, তাও যদি আদৌ হয়। এই কারিগরি প্রযুক্তি কোনো প্রোভাস্টাই পৃথিবীর কোথাও মনসান্তোর হাতে নেই। এইসঙ্গে মনসান্তো জানিয়েছে তাদের অঙ্গীকারের কথাও— মনসান্তো ভারতে কেবল সেইসমস্ত কারিগরিই প্রয়োগ করবে যা পৃথানুপৃথানুভাবে পরীক্ষিত এবং ভারত সরকার অনুমোদিত। কৃষি উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়াতে পারবে এমন নতুন কারিগরির উদ্ভাবনেই মনসান্তোর প্রয়াস। মনসান্তো কৃষকের অধিকারকে মর্যাদা দেয় এবং তারা এও অঙ্গীকার করছে শুধু এমন কারিগরিই (ভারতে) আনা হবে যাতে কৃষকের পছন্দ ও সুযোগের (choices and opportunities) বিস্তৃতি ঘটে।

□ 24 নভেম্বর '98 কর্ণাটক রাজ্য রাইতা সংঘের (KRRS) পরিচালনায় এক বিরাট কৃষক জনতা মনসান্তোর কাছ থেকে পাওয়া তুলাবীজ থেকে তৈরি পরীক্ষামূলক ক্ষেত জালিয়ে দিয়েছে। বাসান্দা, ঐ ক্ষেতের মালিকও এতে সোৎসাহে যোগ দিয়েছে। কারণ, তার তুলাক্ষেতে পোকের আক্রমণ ঘটেছিল ব্যাপক এবং গাছের সাধারণ স্বাস্থ্য হয়েছিল উদ্বেগজনক।

□ আমেরিকা, কানাডা, ইংলন্ড ও ব্রাজিল সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষিক্ষেত্রে মনসান্তোর অপরাধমূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধে মামলা বা কৃষক আন্দোলন চলছে।

□ আগস্ট মাসের ভোজ্য তেলে ভেজাল-কাণ্ডের তদন্তের দাবি জানিয়ে দিল্লী হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

র.ম.

## বহুজাতিক কোম্পানি ‘মনসান্টো’—একই অঙ্গের বহু রূপ

সাম্প্রতিককালে দুনিয়া জুড়ে সাড়া জাগানো একটি নাম ‘মনসান্টো’। আকারে-প্রকৃতিতে ফেঁপে উঠছে প্রতিদিন। তাদের লক্ষ্য দুনিয়া জুড়ে চাষবাসের গোটা বন্দোবস্তটাই কজায় এনে ফেলা। অর্থবল ছাড়াও একাজে তাদের সব থেকে বড় হাতিয়ার আজকের দুনিয়ার সব থেকে বিতর্কিত বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল—বায়োটেকনোলজি। আর পাঁচটা বহুজাতিক কোম্পানির মতই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে কোনো ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা করে না এই কোম্পানি। শত শত অভিযোগ উঠেছে, উঠছে এদের বিরুদ্ধে—পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে। এজন্য গুণাগারও দিতে হচ্ছে অটেল। তাতে আসে যায় না কিছু। সব কিছু ছাপিয়ে সর্বদা সরব এদের প্রচারযন্ত্র। সম্প্রতি ‘দ্য ইকোলজিস্ট’ পত্রিকা তাদের গোটা একটি সংখ্যা নিয়োজিত করেছে এদের কুকীর্তি বর্ণনা করতে। কুখ্যাত এই কোম্পানির সামান্য কিছু কার্যকলাপের আভাষ দিয়ে একে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল ‘বিওবি’র পাঠকদের কাছে। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচিতি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখা হচ্ছে। আপাতত এদের সম্পর্কে বিশদে জানতে আগ্রহী যারা তাদের জন্য যোগাযোগের কিছু হদিসও দেওয়া হল এই সঙ্গে। এটি তৈরি করেছেন শু. মু.।

### মনসান্টো : এক নজরে

এটি একটি বহুজাতিক সংস্থা, মূল দপ্তর—সেন্ট লুইস, মিসৌরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত বছরে 7.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার লাভ করেছে। গত 96 বছর ধরে রাসায়নিক শিল্প এবং কীটনাশকের ব্যবসায় যুক্ত।

ভারতের একজাতের আগাছানাশক দিয়ে তার অম্বপ্রকাশ। আগাছানাশকটির নাম ‘ম্যচেটি’। বেতারে কৃষিকথার আসরে বহুল বিজ্ঞাপিত একটি পণ্য এটি। 1998-এর মে মাসে মনসান্টো গাঁটছড়া বাঁধে মহারাষ্ট্র হাইব্রিড সীড্‌স কোম্পানি লিমিটেড MAHYCO-এর সঙ্গে। তাদের ভাগ ছাব্বিশ শতাংশ। ‘বোলগার্ড (বিটি)’ হলো বায়োটেকনোলজি করে তৈরি তুলোর বীজ, এটা মনসান্টোর প্রোডাক্ট। এটা তারা এখন ভারতের বাজারে ছাড়তে চায় এবং আগামী দু-হাজার সালের মধ্যেই বড় আকারে প্রবেশ করতে চায় এখানকার বাজারে।

### মনসান্টো যা যা বিক্রি করে

‘রাউন্ড আপ’ গুল্মনাশক। এক সময় মার্কিনী চাষীদের কাছ থেকে ব্যাগ প্রতি পাঁচ ডলার করে 1996-এ মনসান্টো ‘প্রযুক্তি মূল্য’ আদায় করত এর জন্য।

‘বোলগার্ড তুলোর বীজ। মনসান্টো একর প্রতি বত্রিশ ডলার ‘প্রযুক্তি মূল্য’ নিত চাষীদের কাছ থেকে। ‘বোভাইন গ্রোথ হরমোন’—এক ধরণের ইনজেকশন, যা দিয়ে গরুর দুধের পরিমাণ বাড়ানো হয়। এই হরমোন যুক্ত দুধ খেলে ক্যানসার হয় এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে।

‘এজেন্ট অরেঞ্জ’ মার্কিন বাহিনী ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়

ভিয়েতনামের ক্ষেতখামারে শস্য ধ্বংস করার জন্য, পাতা ঝরানোর জন্য এর ব্যবহার করেছিল। এর ফলে ভিয়েতনামে কি হয়েছিল তা আমাদের জানা আছে কিন্তু যে সব মার্কিন সৈন্য ঐ সময়ে ভিয়েতনামে যুদ্ধরত ছিলেন তারাও এর বিষক্রিয়া থেকে নিস্তার পায় নি। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম বিকলাঙ্গ হয়েই জন্মাচ্ছে। এটা আজ প্রমাণিত সত্য। সেই ভয়ঙ্কর বিষের প্রস্তুতকারক হলো এই ‘মনসান্টো’ যারা আজ এদেশের পত্র-পত্রিকায় পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে জনাচ্ছে—তাদের নামে মিথ্যা-ই রটনা করা হচ্ছে। তারা এদেশের চাষীদের পাশে দাঁড়াতে চায়, তাদের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করতে চায়।

### মনসান্টো যাদের গ্রাস করে ফুলে উঠেছে

গত কয়েক বছরে মনসান্টো গাঁটছড়া বেঁধেছে বা সরাসরি কিনে নিয়েছে দুনিয়া জোড়া বহু কোম্পানি। এক উনিশ-শ আটানব্বইতেই এই কোম্পানিগুলোর তালিকায় আছে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য ও ল্যাটিন আমেরিকার বীজ ব্যবসার একচ্ছত্র কোম্পানি কারগিল ইন্টারন্যাশনাল, তুলো বীজ ও চাষে খ্যাত ডেল্টা পাইন ল্যাণ্ড কোম্পানি, শস্য ব্যবসার অন্যতম প্রধান অংশীদার ডেকাল্ব কোম্পানি, এদেশের বীজ ব্যবসায়ী মহারাষ্ট্র হাইব্রিড সীড্‌স কোম্পানি (MAHYCO), গমের বীজ ও চাষের ব্যবসায়ীর ইউনিলিভার, অ্যাগ্রোকেমিক্যাল ব্যবসায়ে একচ্ছত্র কোম্পানি আমেরিকান হোম প্রডাক্টস কর্পোরেশন। এই প্রয়াসের প্রত্যেকটির জন্য অর্থ মূল্য দিতে হয়েছে কয়েক-শ থেকে কয়েক হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত।

এর আগে উনিশ-শ সাতানব্বই সালে যে সব কোম্পানি

গ্রাস করেছে বা যাদের সাথে গাঁটছাড়া বেঁধেছে তার মধ্যে আছে শস্য বীজের কোম্পানি ইন্ডেনস ফাউন্ডেশন সীড্‌স, ব্রাজিলের শস্য বীজের কোম্পানি সেমেন্টেস অ্যাগ্রোসেরেস সয়াবীনের কোম্পানি অ্যাসগ্রো অ্যাগ্রোনোমিক্স, জেনোমিক টেকনোলজি খ্যাত নিলেনিয়াম ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স।

এর আগের দু-বছরেও এদের কজায় এসেছে বায়োটেকনোলজি কোম্পানির অ্যাগ্রোসিটাস, ক্যালিফোর্নিয়ার প্ল্যান্ট বায়োটেকনোলজি সংস্থা ক্যালজিন, প্রখ্যাত মার্কে কেমিক্যাল্‌স-এর এক অংশ কেলকো, রোশ্‌ কোম্পানির অংশ বিশেষ।

মনসান্টো কোম্পানির জনৈক কর্তা তাই একবার সগর্বে বলেছিলেন — 'What you're seeing is not just a consolidation of seed companies, it's really a consolidation of the entire food chain'

মনসান্টোর সমাধান : জমানো বীজ থেকে আর গাছ নয়! বুলু দূরদর্শন দেখাছিল—একের পর এক বিজ্ঞাপনের সার চলেছে 'পেশ হলো নতুন....' এবার বাজারে এলো নতুন '.....' ইত্যাদি। নতুনে নতুনে ছয়লাপ! যেন পুরনো আর কিছুই থাকবে না। পুরনো যা কিছু সবই বাতিলযোগ্য। মনসান্টো কোম্পানিও যদি তার পণ্যের বিজ্ঞাপন দূরদর্শনে দিতে শুরু করে (দিন আগত ঐ!) তাহলে বোধহয় এইভাবে ঘোষণা করবে — 'এই বার এসে গেল নতুন যুগ—পুরনো বীজ থেকে গাছ নয়। ঘরে বীজ জমিয়ে রাখার ফালতু বামেলা থেকে মুক্তি দিতে নতুন যুগ এসে গেছে। আপনার গাছের বীজ আর ফসল দেবে না— কেননা তা পুরনো—তাই মৃত। এসে গেছে নতুন যুগের নতুন কৃষি-প্রযুক্তি —টারমিনেটর টেকনোলজি। বছর বছর টারমিনেটর বীজ কিনুন গোলা ভরা ফসল তুলুন....।'

গল্প নয়—সত্যি

মানবজাতি চাষাবাস আবিষ্কারের পর থেকেই নামহীন গোত্রহীন দক্ষিণ গোলাপ্দের কৃষি-কর্মীরা কৃষি-বিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করে এসেছেন এতকাল। বুনো গাছ আর শস্যকে উন্নত ফসলে পরিণত করেছেন। বারে বারে বীজ বুনো যে সব বিভিন্ন শস্যাদি গত কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসছে—বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সেগুলিকেই হাতিয়ে নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসার হকদার হয়ে উঠেছে। শুধু খাদ্যই নয় পরিধেয়ের কাঁচামাল থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় তাবৎ বস্তুসামগ্রীর খাদ্য-বস্তু-স্বাস্থ্য তাদের কুক্ষিগত আজ। প্রতিটি মানুষকেই যে কোনো মূল্যেই হোক সংস্থান করতে হবে। আমরা

ছোট বয়েস থেকেই শুনে আসছি কৃষকের শেষ সম্বল তার শস্যের বীজ কিন্তু এবারে কৃষক আর সেই শস্যের বীজ নিজে উৎপাদন করতে পারবে না। জামিয়েও রাখতে পারবে না।

গল্প হলেও সত্যি !

দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার কলকাতা সংস্করণে গত ছয়,সাত ও আট ডিসেম্বর—এই তিন দিন ধরে মনসান্টো কোম্পানি বিস্ময়কর বিজ্ঞাপন দিয়েছে। প্রায় 70,000 টাকা বিজ্ঞাপন প্রতি খরচ করে যা বলতে চেয়েছে তার মর্মার্থ হলো :

(ক) সে তুলোর বীজের ওপর পরীক্ষা করছে; (খ) সে এখানে টারমিনেটর পরীক্ষা করছে না; এবং (গ) পৃথিবীতে কোথাও এই বীজ নিয়ে পরীক্ষা করছে না।

টারমিনেটর প্রযুক্তি কি?

বীজ থেকে যখন গাছ হয় তখন সেই গাছে যে বীজ তৈরি হয় তার প্রতিটি থেকেই ভবিষ্যতে গাছ তৈরি হতে পারে এবং হয়ও। নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রতিটি বীজ থেকে একই জাতের, একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছ পাওয়া সম্ভব। এইভাবেই আমরা এক জাতের ধান বা গমের বীজ থেকে একই জাতের ধান বা গম পাই। ভারতের খাদ্যমন্ত্রকও মোট উৎপাদিত শস্যের প্রায় বারো শতাংশ ভবিষ্যতে বীজের জন্য ধরে রাখেন।

প্রথমদিকে বীজ কোম্পানিগুলো কৃষকদের এমন জাতের বীজ সরবরাহ শুরু করে যাতে সেই বীজ পুঁতে যে গাছ হবে তাতে গাছ পিছু বীজের সংখ্যা, কৃষকরা তাদের পিতৃ-পিতামহের আমলের যে বীজ উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যবহার করত তা থেকে বেশি। অবশ্য এর জন্য ক্ষেত পিছু অনেকগুণ, বেশি সার, অনেক বেশি জল আর অনেক বেশি পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করতে হতো। সুতরাং পরের বারে আরও কম বীজে অনেক বেশি ফসল ফলাবে বলে বীজ কোম্পানিগুলো প্রচার করত। এতে কৃষকদের নগদে টান পড়লেও তারা মাটির হাঁড়িতে প্রতি বছরের বীজ জমিয়ে রাখতে পারত। কিন্তু তাতে কোম্পানির মুনাফায় টান পড়ে। অতএব কৃষকদের বীজ সংরক্ষণ করে রাখার মতো কোম্পানির স্বার্থবিরোধী এই বদ অভ্যাস ছাড়ার উপায় খুঁজতে হলো। বীজ একবার ফলন দিয়েই যাতে পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা হারায় তার রাস্তা আবিষ্কার করতে হলো। এল টারমিনেটর টেকনোলজি।

কোম্পানিগুলো তাদের পেটোয়া বিজ্ঞানীদের দিয়ে শস্যের বীজে এমন এক বিষ ঢুকিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করল যাতে করে গাছ যত বয়েসে বাড়বে এই বিষের প্রভাবে বীজ তত বন্ধাত্মর দিকে এগিয়ে যাবে। ফল হিসেবে এই বীজ যদি আবার মাটিতে

পৌতা হয় তবে তা থেকে আর নতুন চারা গজাবে না। অর্থাৎ এই বিশেষভাবে প্রস্তুত বীজ পুঁতে চাষ করলে, অনেক সার, অনেক জল আর অনেক কীটনাশক ছড়ালে যদিও-বা বেশি ফসল ফলে, চাষীকে কিন্তু বছর বছর এই বীজ কেনার জন্য কোম্পানির দোকানেই যেতে হবে। এমনই এক কোম্পানি হলো মনসান্টো। যে চাল, ডাল সয়াবীন, তুলোর বীজ বেচে, সার বেচে, কীটনাশক বেচে এবং খাবার বেচে। খাদ্য বস্ত্রে এত বড় বহুজাতিক সংস্থা ভূভারতে নেই। ভারতে আপাতত তার আয়প্রকাশ এক জাতের তুলোর বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অছিলায়। কিন্তু ভারতে কেন? একটু ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক।

যন্ত্রচালিত মাকু দিয়ে মহারানি ভিক্টোরিয়ার দেশ ব্রিটেনে মহাসমারোহে 'শিল্প বিপ্লব'-এর উদ্বোধন হলো। ভারতের লুটের পয়সা আর কালী আদমিদের ঘাম-শ্রম-রক্তের বিনিময়ে ব্রিটিশ ব্যবসা ঘোড়ায় চড়ে চাবুক হাতে উত্তর আমেরিকার তুলোর ক্ষেত-খামারের নিগ্রো-কাফ্রি-হাবসি ক্রীতদাসদের আরও আরও বেশি তুলো উৎপাদনের জন্য চাবুক কষাতে লাগল। এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীলকর সাহবদের অত্যাচারে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মরো হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। ঠিক এই অবস্থাতে ব্রিটিশ কোম্পানি 'এল হুইটনে,' 1793 সালে ভারতীয় তুলোর পেটেন্ট নেয়। এই পেটেন্ট নেওয়ার পর এই কোম্পানির মূল লক্ষ্য হয়, কি করে ভারতীয় তুলো চাষের সর্বনাশ করা যায়। মনে রাখতে হবে, এই 'হুইটনে' কোম্পানিই বিশ্বে সর্বপ্রথম মাস্কাট রাইফেলের পেটেন্ট নেয় (1798 সালে চুয়াড় বিদ্রোহের প্রাক্কালে)—যে রাইফেল ব্রিটিশ ভারতের বৃকে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ দমনের মূল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও নীলকর সাহেবরা এই রাইফেলের কুঁদো দিয়ে দক্ষ তুলো চাষীদের ডানহাতের বুড়ো আঙুল ভেঙে দিত। তারপর আইন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বস্ত্রসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু বিদেশী ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে ভারতীয় বস্ত্রসত্তার বিদেশে রপ্তানি করা শুরু করে। ভারতীয় বস্ত্র তার দেশী তুলোর জন্য এতই উঁচু মানের ছিল যে তা বিদেশীবাজারে ম্যানচেসটারের একচেটিয়া আধিপত্যে ধ্বস নামিয়ে দেয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বহুজাতিক বানিয়ারা ভারতকে তুলো সুতো বস্ত্রের মোট রপ্তানিকারক দেশ থেকে মোট আমাদানিকারক দেশে পরিণত করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়েই আসছে। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দীর বঞ্চনা-বৈষম্যের পরেও কেবল ভারতীয় তুলো চাষীদের সহজাত দক্ষতা এবং শ্রমের জন্য আজও ভারতে তুলোর কোনো স্বাভাবিক অভাব নেই।

## অতএব মনসান্টো

মনসান্টো চাইছে এমন এক বিষয়যুক্ত তুলোর বীজ বাজারে ছাড়তে যা নাকি এক জাতের পোকাকার (bollworm) আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। জানা নেই, এই তুলোর বীজ থেকে আবার গাছ জন্মানো সম্ভব হবে কিনা।

মুম্বই-এর একটি সংস্থার (Mahyco Biotech Pvt. Ltd.) সঙ্গে ছবিবিশ শতাংশের ভাগীদার হিসেবে অর্থনৈতিক গাঁটছড়া বেঁধে মনসান্টো কোম্পানি 'বোলগার্ড বিটি' নামে বিষয়যুক্ত এক তুলোর বীজের পরীক্ষামূলক চাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। জাতীয়তাবাদী বাজপেয়ী সরকার (যাদের ব্রিটিশ অনুরাগের সীমা নেই) কর্নাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশের প্রায় চল্লিশটি পরীক্ষামূলক চাষের জমিতে তড়িঘড়ি এই তুলোর চাষের অনুমতি দিয়ে দেয়। কৃষির মতো বিষয় রাজ্যের হাতে থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করে নি। কর্ণাটকের মালডাওড্ডা গ্রামের যে ব্যক্তির জমিতে বোনা হয়েছিল এই তুলো, বোনার সময় তাঁর সম্মতি পর্যন্ত নেওয়া হয় নি। যদিও, Mahyco পরে লিখিতভাবে এই জমির মালিকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এখানেই কেলেঙ্কারির শেষ নয়। রাতের আঁধারে, চুপি চুপি Mahyco-র পাইক বরকন্দাজরা অনিয়মিত মাত্রায় এবং পরিমাণে (যা কিনা কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রকরণেই পড়ে না) সার এবং কীটনাশক প্রয়োগ করে চলে। এতকিছুর পরে মোট ফল হলো :

এক, যে bollworm এর হাত থেকে এই তুলোর চারা বাঁচানোর জন্য এত অয়োজন, চারাগুলো সেই পোকা দিয়েই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই পোকা ছাড়াও অন্যান্য দু-জাতের পোকাও এই ক্ষেত আক্রমণ করে।

দুই, এই বোলগার্ড তুলোর চারা, স্থানীয় স্বাভাবিকভাবে লভ্য তুলোর বীজের চারার চেয়ে আকারে অর্ধেক বড় হয়।

এই তুলোর ক্ষেতটিতে ক্ষেতের মালিক স্বয়ং আঙুন লাগিয়ে দেন। একই ঘটনা ঘটে অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটি তুলোর ক্ষেতে, যেখানে জমির মালিকরাই ফসলের অগ্নাহতি নিষ্পন্ন করেন। এই বিপজ্জনক জীনপ্রযুক্তির ফলে বিজ্ঞানীরা যা যা আশঙ্কা করেন তা হলো :

ক. জীন প্রযুক্তি দ্বারা পরিবর্তিত এই সব বীজ আশপাশের ক্ষেতের স্বাভাবিক বীজের সঙ্গে পরাগসিঞ্চনে এমন সব বিচিত্র বীজের জন্ম দিতে পারে যার বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ধর্ম নিয়ন্ত্রণে আনা মুশকিল এবং তা চাষ ব্যবস্থার ওপর স্থায়ী প্রভাব ফেলতে

পারে। ইংলন্ডে, মনসান্তোর এক ধরণের জিনপ্রযুক্তি জাত তৈলবীজ পাশের ক্ষেতের তৈলবীজের সঙ্গে সিঞ্চিত হয়ে এমন এক মারাত্মক জাতের জন্ম দিয়েছিল যে, তাদের প্রত্যেকটিকে মেরে ফেলতে হয়। গত তিন বছর সেখানে ফসল ফলানো হচ্ছে না। অন্তর্প্রদেশে বোলগার্ড তুলোর ক্ষেত্রে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

খ. এই বীজ খাওয়ার কারণে জমি এবং ফসলের পক্ষে অনেক উপকারী পোকাকারও মৃত্যু ঘটে। ফলে আগাসী পোকাকার সংখ্যায় বাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। এর ফলে ফসলে মহামারীর আশঙ্কা থেকে যায়। নিউজিল্যান্ড এবং আইসল্যান্ডে এই ঘটনা ঘটান পর সারা ইউরোপে কোনো কোনো পরীক্ষামূলক চাষের জমিতে মনসান্তোকে বীজ বোনার যে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল তা কেড়ে নেওয়া হয়।

#### মনসান্তোর অন্য কয়েকটি 'কৃতিত্ব'

1. মনসান্তোর জীবপ্রযুক্তিজাত টম্যাটোর পুরোটাই 1996 সালে বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়। এর কারণ ছিল এই টম্যাটোর শোচনীয় কম উৎপাদন এবং ভোক্তারা এর স্বাদ এবং চেহারা পছন্দ করে নি।

2. 1997-এ কানাডাতেও জীবপ্রযুক্তিজাত রেপসীড বীজের পুরোটাই বাজার থেকে তুলে নিতে হয় কেননা কানাডার সম্পন্ন

চাষীরা আদালতে মামলা করে প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এই তৈলবীজ মনসান্তোর বিজ্ঞাপিত কোনো গুণই দেখায় নি।

3. 1996-এ মার্কিন দেশে, এই বোলগার্ড তুলো শেষ পর্যন্ত bollworm এর আক্রমণে খতম হয়ে গেলে মনসান্তো প্রায় 2 বিলিয়ন ডলার মামলায় জড়িয়ে পড়ে ক্ষতিপূরণ দেয়। মেক্সিকো থেকেও তারা পাততাড়ি গুটায়।

4. 20 সেপ্টেম্বর 1998, ব্রাজিল সরকার, মনসান্তো এবং স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে 'পারস্পরিক সম্মতির' ভিত্তিতে জীবপ্রযুক্তিজাত বীজের চাষ নিষিদ্ধ করে।

5. ভারতে অন্তর্প্রদেশ সরকার গত আটানব্বই-এর নভেম্বরে মনসান্তোর সবকটি 'পরীক্ষামূলক' চাষের জমি পুড়িয়ে দেয় এবং আগামীদিনে রাজ্য সরকারের সম্মতি ছাড়া এই জাতীয় কোনো পরীক্ষার ওপর নিষধাজ্ঞা জারি করে।

পুনশ্চ : 29.12.98 *দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা* জানাচ্ছে যে মার্কিন সরকার এবং ডেলটা পাইনল্যান্ড সংস্থা 'টারমিনেটর জিন' এর জন্য ভারতে পেটেন্টের আবেদন করছে। সম্ভ্রতি এই ডেলটা পাইন ল্যান্ড সংস্থাটি মনসান্তো কিনে নিয়েছে।

সারা পৃথিবীতে যখন এই কুখ্যাত কোম্পানির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছে তখনই এই কোম্পানির গরজ বেড়েছে ভারতের মতো দেশে অনুপ্রবেশের; কারণ খুবই পরিষ্কার। এদেশে নীতি নির্দ্ধারকদের নোয়ানো যায় সহজে—সেকথা সবাই জানে।

Phone : 667-1429 (Off.)  
661-0319 (Resi)  
661-0405

## M/s. Vishal Construction

Government Contractor of Water Works :  
Consultant, Engineers, Manufacturer and Supplier of  
'PILOT' Brand C.I. Valves & all Pipe Fittings

Workshop & Office :

(Dutta Industrial Estate)  
Ichapur, Sealdanga, Santragachi,  
Howrah 711 104

Office :

Village : Bazarpara  
P.O. Uluberia R.S.  
Howrah 711 315

তৃতীয় পর্ব

## বিষয় : পরিবেশ

পরিবেশ কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়; মানুষের জীবন-জীবিকায় সম্পৃক্ত হয়ে আছে পরিবেশ। পরিবেশের বিপন্নতা তাই মানুষেরই বিপন্নতা। বিজ্ঞান-কারিগরির অপপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ পরিবেশের বিপন্নতার অন্যতম প্রধান কারণ। আর সেই বিপন্নতা থেকে মুক্তি পেতে আমরা আবার বিজ্ঞান কারিগরিরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু পরিবেশমুখী একটি স্বাভাবিক, বাস্তব ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে সভ্যতার কর্মকাণ্ড প্রসারিত করতে না পারলে পরিবেশজনিত বিপন্নতা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। পরিবেশ আইন-কানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মধ্যেও থাকা চাই সেই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন। এমনই এক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধানের উদ্যোগ—‘বিষয় : পরিবেশ’। যে কেউ এ-বিভাগের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন—কমবেশি দু-হাজার শব্দের মধ্যে। মতামত, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর খবরাখবর, টীকা-সমীক্ষাদিও প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে।

### পরিবেশ আইন-কানুন : নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

[ চার ]

পান-ছুও সাল তো হোলো  
সেদিনের কথা ইয়াদ আসলে  
আজও আমি মুখে খাবার উঠাতে পারি না.....।  
নয়া মিশিন এলো—ইনডাকশন ফারনিস;  
আরক ফারনিস চালাতাম আমরা  
নোতুন মিশিনেও জ্যুটি হলো আমাদের  
এ ফারনিসটা বিলকুল আন্যরকম  
আনেক চটপট কাম করে  
আমরাও বেজায় খুশ।  
হাঠাৎই হোলো লোডশেডিন  
দশ মিন্টের মধ্যে লোহার উপরেটা শক্ত হোয়ে গেলো।  
আমি তখন ক্যানটিন দিকে গেলম।  
চা-জন্যে বোসে আছি  
দড়তে দড়তে মিশির এলো, বোললো-  
অ্যাকসিডেন হোয়েছে নয়া ফারনিসে।  
এসে দেখলম  
বাবুয়ারা চারটে তাগড়াই জোয়ান  
রেলিনের ধারে পোড়ে আছে  
পুরো বদন জুলে গেছে!  
শুনলম কি  
কারিন্ট আসলে পর  
বাবুয়ারা লোহার উপরে খোঁচালো  
অমনি ভিতরের লোহা ফুলে উঠলো  
শব্দ করে ছড়িয়ে পড়লো  
তুবড়ি যায়সা, ওদেরকে নাহিয়ে দিলো!  
শুনতে শুনতে আমি অগিয়ান হোয়ে গেলম!

পরিবেশ সম্পর্কিত ভারতীয় আইন-কানুনকে তিনটি প্রধান দলে ফেলে এ আলোচনা শুরু হয়েছিল। ইতিপূর্বে প্রথম দলভুক্ত অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত আইনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এবারের আলোচনা দ্বিতীয় দলের আইন নিয়ে যেগুলো নামে পরিবেশ আইন না হলেও পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এরকম আইনের সংখ্যা প্রায় ডজনখানেক হলেও তিনিধিমূলক দুটিমাত্র আইন এখানে আলোচিত হবে (সারণী : 3)।

সারণী : 3

পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যুক্ত আইন

মূল আইন	অনুসারী বিধিনিয়ম ইত্যাদি
কারখানা (সংশোধনী)আইন, 1987 [The factories(Amendment) Act. 1987]	রাজ্য সরকারগুলি আইনানুগ কার্যনির্বাহী বিধিনিয়ম তৈরীর অধিকারী।
মোটরগাড়ি আইন, 1988 [MotorVehicles Act, 1988]	কেন্দ্রীয় মোটর ভিহিকিলস বিধিনিয়ম, [Central Motor Vehicles Rules, 1989]ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধিনিয়ম।

কারখানা আইন

ভারতে প্রথম কারখানা আইন প্রণীত হয়েছিল 1881 খ্রিস্টাব্দে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পুরনো আইনের স্থান নেয় ‘কারখানা আইন, (1948)’। তারপরও নানা ছোটোখাটো সংস্কার হয়েছে

আইনটির। অবশেষে পরিবেশ ভাবনার ছাপ নিয়ে 'কারখানা (সংশোধন) আইন, 1987' রূপে নবকলেবর গ্রহণ করেছে।

কলকারখানায় কর্মরত মানুষদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করার সাংবিধানিক নীতিকে বাস্তবে রূপদান করাই এই আইনের মূল লক্ষ্য। অনুরূপ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ কর্মক্ষেত্র, যন্ত্রাদি বা বস্তু-কেন্দ্রিক বিশেষ বিশেষ আইনও আছে। যেমন খনি ও বন্দর কর্মীদের জন্য আছে দ্য মাইনস অ্যাক্ট ও ডকওয়ার্কার্স (সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার) অ্যাক্ট; বয়লারকে কেন্দ্র করে আছে দ্য বয়লার অ্যাক্ট; পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের জন্য দ্য পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, কীটনাশক পদার্থ নিয়ে কাজকারবারের জন্য দ্য পেস্টিসাইডস অ্যাক্ট, পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রের জন্য আছে দ্য অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্ট ইত্যাদি।

কারখানা আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার হয় না এবং অন্তত কুড়িজন একসঙ্গে কাজ করে অথবা শক্তির ব্যবহার আছে এবং অন্যান্য দশজন একত্রে কাজ করে এমন যে কোনো স্থান কারখানা হিসেবে গণ্য হবে। স্বভাবতই, খনি, বন্দর, পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ইত্যাদি সেই সংজ্ঞার বাইরে। আবার হোটেল রেস্তোঁরা, চলমান গাড়ির কামরা, এঞ্জিন, সেনাবাহিনীর কোনো চলমান ইউনিট এবং কম্পিউটার তথ্য-প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রকেও এই সংজ্ঞার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত শিল্পোৎপাদন ইউনিটকেও রাজ্য সরকার কারখানা আইনের এক্তিয়ারের বাইরে রাখতে পারেন।

কারখানা আইন কার্যকর করার প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে রাজ্যের শ্রম মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি বিশেষ বিভাগ, কারখানা পরিদর্শন নির্দেশালয় (Factory Inspectorate) -এর ওপর। এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান অফিসার হলেন চিফ ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ। রাজ্য নির্দেশালয়গুলির কাজকর্মে সমন্বয়সাধন ও ক্ষেত্রবিশেষে দিক নির্দেশ করার জন্য আছে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের অধীনে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফ্যাক্টরি অ্যান্ড ভাইস সার্ভিস অ্যান্ড লেবার ইনস্টিটিউট (DGFLSI)।

কারখানা আইন শ্রমিকদের কাজের সময় বেঁধে দিয়েছে সপ্তাহে 48 ঘন্টা। এছাড়া তাদের বিশ্রাম ও ছুটি, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, পোশাক, পানীয় জল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সরঞ্জাম ইত্যাদি পাবার অধিকারও আইনে স্বীকৃত। শিশুশ্রমিক (14 বছর বয়সের নীচে) নিয়োগ নিষিদ্ধ করার এবং নারী শ্রমিকদের বিশেষ কতকগুলি সুযোগ সুবিধার ও সন্ধ্যা সাতটা থেকে সকাল ছটার মধ্যে কারখানা চত্বরে কোনো নারী শ্রমিককে না রাখারও বিধান আছে আইনে।

নথিভুক্ত কারখানার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ব্যবস্থাদি আইনের সংস্থান মেনে ঠিকঠাক আছে বা চলছে কিনা তার দেখভালের দায়িত্ব ফ্যাক্টরি ইনস্পেক্টরদের। কর্মপরিবেশে সুরক্ষিত, প্রশিক্ষিত ও সচেতন কর্মীবাহিনী যে কোনো কারখানার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এরকম কারখানা থেকে আশপাশের পরিবেশ বা লোকালয়ে দূষণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও কম। একথা মাথায় রেখে আলোচ্য আইনটির পরিবেশকেন্দ্রিক নতুন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যাক :

□ বিপজ্জনক প্রক্রিয়ার (Hazardous processes) সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম তপশিলে (Schedule) 29 প্রকার শিল্প বিপজ্জনক প্রক্রিয়ানির্ভর শিল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

□ বিপজ্জনক প্রক্রিয়ানির্ভর নতুন কারখানা স্থাপনে বা পুরনো কারখানার সম্প্রসারণে স্থান নির্ধারণ অনুমোদনের জন্য স্থান মূল্যায়ন কমিটির (Site Appraisal Committee) সুপারিশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চিফ ইনস্পেক্টর (অফ ফ্যাক্টরিজ)-কে চেয়ারম্যান করে রাজ্য সরকার এই কমিটি গঠন করবেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের প্রতিনিধিরা ছাড়াও পেশাগত রোগ বিশেষজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদেরও এই কমিটিতে রাখতে হবে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার স্থান অনুমোদন করলে পৃথকভাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে না।

□ নতুন ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার অন্তত 30 দিন আগে, পুরনোর ক্ষেত্রে আইন চালু হবার 30 দিনের মধ্যে চিফ ইনস্পেক্টরকে বিপজ্জনক প্রক্রিয়ার বিশদ তথ্য জানাতে হবে। অন্যথায় আইনলংঘণের শাস্তির ওপরেও লাইসেন্স বাতিল করা হতে পারে।

□ দ্বিতীয় তপশিলের তালিকায় 120টি ক্ষতিকর বা বিষাক্ত পদার্থ চিহ্নিত করে যে কোনো ধরণের কারখানার ভেতরে তাদের সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

□ যে সব পেশাগত রোগ কর্মীদের মধ্যে দেখা গেলে ফ্যাক্টরির ম্যানেজারকে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে তার সংখ্যা বাড়িয়ে 22 থেকে 29 করা হয়েছে (তৃতীয় তপশিল)।

□ বিপজ্জনক প্রক্রিয়ানির্ভর ফ্যাক্টরির ভেতরে ও বাইরে কি ধরণের সম্ভাব্য বিপদ হতে পারে এবং তাদের মোকাবিলায় কি ধরণের সাবধানতা ও পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সে-সব তথ্য ভেতরের ও আশপাশের এলাকার মানুষজনকে কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো বাধ্যতামূলক। কারখানার বর্জ্যের

প্রকৃতি, পরিমাণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যও জানাতে হবে। কারখানার ভেতরে উপযুক্ত স্থানে অধিকাংশ শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় এই সব তথ্যসম্বলিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। স্থানীয় মানুষের মধ্যেও প্রচার (publicise) করতে হবে। চিফ ইনস্পেক্টর এবং স্থানীয় সরকারি বা স্বায়ত্বশাসন কর্তৃপক্ষকেও এসব তথ্য এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য গৃহীত নীতি-পদ্ধতির বিশদ তথ্য জানাতে হবে। (ধারা 41B—Compulsory Disclosure of Informations)।

□ আভ্যন্তরীণ আপৎকালীন পরিকল্পনা ও বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ পন্থা পদ্ধতি (On Site Emergency Plan and Disaster Control Measures) নির্দিষ্ট করার দায়িত্ব কারখানা কর্তৃপক্ষের। চিফ ইনস্পেক্টর সহায়তা করবেন। এইসব তথ্যও শ্রমিককর্মী ও আশপাশের এলাকার মানুষকে জানাতে হবে।

□ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে (41H ধারা)। যে কোনো শ্রমিক সম্ভাব্য বিপদ বা দুর্ঘটনা সম্পর্কে কারখানার নিরাপত্তা কর্মিটি বা কর্তৃপক্ষ বা এমনকি ফ্যাক্টরি ইনস্পেক্টরকেও সরাসরি জানাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি না নিয়ে ইনস্পেক্টররা তাঁদের খবরের সূত্র প্রকাশ করবেন না।

□ সংশোধিত আইনে ফ্যাক্টরি ইনস্পেক্টরদের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রয়োজনবোধে তাঁরা পরিদর্শন-তদন্ত-অনুসন্ধান করতে তো পারেনই, কারখানার বিরুদ্ধে মামলা করা বা তার অনুমতি দেবারও অধিকারী তাঁরাই। সদুদ্দেশ্যে গৃহীত কোনো পদক্ষেপের জন্যই তাঁদেরকে অভিযুক্ত করা যাবে না। বিচারালয়ের কাজের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যদি ইনস্পেক্টররা কারখানার উৎপাদন বা ব্যবসাসংক্রান্ত তথ্যাদি ফাঁস করেন, কেবল তখনই তাঁরা সর্বাধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং/অথবা এক হাজার টাকা জরিমানার শাস্তি পেতে পারেন।

□ আইনের বিভিন্ন ধারা পালনে ব্যর্থতা বা লংঘনের অপরাধে দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি-মৃত্যু ইত্যাদি ঘটলে কারখানার কর্তৃপক্ষের বিচার ও শাস্তির বিধান আছে। সর্বোচ্চ কারাবাস 2 বছর ও সর্বোচ্চ জরিমানা এক লাখ টাকা। তবে বিপজ্জনক প্রক্রিয়ার ফ্যাক্টরির জন্য যে সব নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে (41B, 41C, 41H ধারা) যেগুলি লংঘনের অপরাধে সর্বাধিক 7 বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং সর্বাধিক 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

□ অপরাধী হিসেবে কারখানার সংগঠক (Occupier) বা ম্যানেজার বা উভয়েই অভিযুক্ত হতে পারেন। তবে তাঁরা যদি

প্রমাণ করতে পারেন যে, অপরাধটি ঘটেছে তাঁদের সর্বাধিক আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অজ্ঞাতে, বিনা অনুমতিতে বা বিনা যোগসাজসে অন্য কোনো ব্যক্তি অপরাধটির জন্য দায়ী এবং সেই অপর ব্যক্তিকে যদি তিন মাসের মধ্যে আদালতে হাজির করাতে পারেন, তবে তাঁরা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন।

□ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসের চেয়ে নিম্ন আদালতে এই আইনের অধীন মামলা আনা যাবে না এবং কারখানা যে স্থানে অবস্থিত অথবা যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই এলাকার আদালতের এন্ট্রিয়ারভুক্ত।

### মোটরগাড়ি আইন

মোটর ভিহিকিলস্ অ্যাক্ট 1939, এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, 'মোটর ভিহিকিলস্ অ্যাক্ট, 1988 এবং ইতিমধ্যে সংশোধিতও হয়েছে (1994)। সাধারণভাবে বলতে গেলে মোটরগাড়ির রেজিস্ট্রেশন-পারমিট, ড্রাইভার কন্ট্রোলদের লাইসেন্স, যান চলাচল ও পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ, মোটর দুর্ঘটনা ও তৎসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি এই আইনের এন্ট্রিয়ারভুক্ত।

রাজ্য মোটর ভিহিকিলস দপ্তর এই আইনের প্রধান প্রয়োগ কর্তৃপক্ষ।

পরিবেশের সঙ্গে এই আইনের প্রয়োগ তিনটি সূত্রে: এক, মোটরগাড়ি থেকে শব্দদূষণ; দুই, মোটরগাড়ি থেকে ধোঁয়া গ্যাস বাষ্প ইত্যাদি নির্গমন; এবং তিন, বিপজ্জনক (রাসায়নিক) পণ্য বা বর্জ্য পরিবহণ।

### কেন্দ্রীয় মোটর ভিহিকিলস বিধিনিয়ম অনুযায়ী

কোনো মোটরগাড়িতে এমন কোনো হর্ন লাগানো চলবে না যা থেকে ক্রমাগত বিভিন্নরকম আওয়াজ হয় বা যা কানের পক্ষে পীড়াদায়ক—অস্বাভাবিক কর্কশ বা তীক্ষ্ণ। ইলেকট্রিক বা অন্য প্রকার হর্ন যাই ব্যবহার করা হোক না তা ভারতীয় মানক সংস্থা (Bureau of Indian Standards) দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে; এবং ব্যবহারের জন্য রেজিস্ট্রেশনের সময়োই মোটর ভিহিকিলস দপ্তরের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

□ প্রত্যেক মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কমানোর জন্য সাইলেন্সার লাগাতে হবে।

□ প্রত্যেক মোটরগাড়ি এমনভাবে উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে তা থেকে নির্গত শব্দ সর্বদা নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে।

পরিবেশ আইনের অধীনে ঘোষিত পরিবেশ (সুরক্ষা)

বিধিনিয়ম, 1986-র প্রথম তপশিলে বিভিন্ন রকম নতুন মোটর গাড়ির (ex-factory) জন্য শব্দ সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, 1992 সালের পর যা প্রযোজ্য।

পরিবেশ (সুরক্ষা) বিধিনিয়ম, 1986 -রই চতুর্থ তপশিলে মোটরগাড়ি থেকে ধোঁয়া গ্যাস ইত্যাদি নির্গমনের উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় মোটর ডিহিকিলস্ রুলসেসেও এগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে :

পয়লা মার্চ, 1990 থেকে রাস্তায় বেরোনো সমস্ত পেট্রোল ও ডিজেল-চালিত মোটরগাড়িকে নির্গমনের উর্ধ্বসীমা মেনে চলতে হবে। কারখানা থেকে উৎপাদিত হয়ে বেরোনোর সময়েও নির্দিষ্ট উর্ধ্বসীমার মধ্যে থাকবে নির্গমন। গাড়ি উৎপাদক সংস্থাকে এই মর্মে সার্টিফিকেট দিতে হবে যে চালু অবস্থায়ও ঐ মোটর গাড়ি নির্গমন সীমার মধ্যে থাকবে। 1992-এর পয়লা এপ্রিলের পর থেকে সবধরণের মোটরগাড়ির বেলায় এ নিয়ম প্রযোজ্য।

[গাড়ির রকম ও পরীক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী স্থির (অথবা চলমান অবস্থায়) বিভিন্ন নির্গমন সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে। এইসব পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্গমন দিতে বেরিয়ে আসা কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোক্যার্বন এবং সীসা পরিমাপ করা যায়।]

সাব ইনস্পেক্টর বা তার ঊর্ধ্বতন যে কোনো পুলিশ আফিসার এবং মোটর ডিহিকিলস্ ইনস্পেক্টররা যে কোনো মোটরগাড়ির নির্গমন পরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারবেন। পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অনুমোদন করবেন রাজ্য সরকার।

দারি ট্রাক ইত্যাদিতে বিপজ্জনক পণ্য বা বর্জ্য পরিবহণের ব্যাপারটি আমাদের দেশে যথেষ্ট ঝুঁকির। সারা পৃথিবীর মোট মোটরগাড়ির মাত্র এক শতাংশ ভারতে হলেও, মোটর দুর্ঘটনায় ভারতের অবদান সারা পৃথিবীর প্রায় ছয় শতাংশ। আবার কেরোসিন, ডিজেল, এলপিজি (রান্নার গ্যাস), অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন ইত্যাদি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ট্রাক লরিভেই পরিবাহিত হয় বেশি।

আশির দশকের মাঝামাঝি বিপজ্জনক পণ্য পরিবহণে নিরাপত্তা ব্যবস্থার সন্ধানে রাষ্ট্রপুঞ্জ (United Nations) একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটির সুপারিশসমূহ পৃথিবীর বহু দেশে গৃহীত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক কোড হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দেশ ও পরিবহণের প্রকৃতি (যেমন, রেল, মোটর, নৌ, বিমান) অনুযায়ী সামান্য অদল বদল প্রয়োজন হতে পারে। ভারতের মোটর পরিবহণেও এগুলি অল্পবহু পরিবর্তন সহ গৃহীত হয়েছে এবং মোটর ডিহিকিলস্ রুলসেস, 1989-এ অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। বিপজ্জনক

পণ্য, বর্জ্যবাহী মোটরগাড়ির পরিবহণ পারমিটের সঙ্গে পালনীয় শর্ত হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

□ রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি বিপজ্জনক পদার্থ একটি চার অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত হবে (Substance Identification No বা SIN)। এছাড়াও থাকবে প্রতিটি পদার্থ থেকে উদ্ভূত বিপদ বা ঝুঁকি নির্দেশক আর একটি কোড যা হবে গুটিকয় সংখ্যা ও বর্ণ দিয়ে তৈরি (Hazchem Code)। বিপজ্জনক সমস্ত রকম পদার্থকে নয়টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করে প্রতি শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ হয়েছে একটি বিশেষ চিহ্নচিত্র : বরফি (ডায়মন্ড) আকৃতির একটি রঙীন ঘরের মধ্যে থাকবে পদার্থটির পরিচয়—ভাষায় ও চিহ্নচিত্রে। যেমন বিস্ফোরক পদার্থের প্রথম শ্রেণীর। কমলা রং এর নির্দিষ্ট সাইজের বরফির মধ্যে লেখা থাকবে 'EXPLOSIVES' এবং থাকবে একটি বিস্ফোরিত বোমার সাদা কালো চিহ্নচিত্র। দাহ্য গ্যাসীয় পদার্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর। বরফির লাল জমিতে আঙনের লকলকে সাদা-কালো শিখার চিহ্ন তাদের পরিচয়ঙ্গাপক। ইত্যাদি।

কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রস্তাবিত নবম বিপজ্জনক শ্রেণীটি ভারতের মোটর ডিহিকিলস্ রুলসেসে নেওয়া হয় নি। এটি ছিল 'বিবিধ বিপজ্জনক পদার্থ' নামে। মোট 304টি রাসায়নিক পদার্থ বিপজ্জনক হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে মোটর ডিহিকিলস্ রুলসেসে।

□ বিপজ্জনক পদার্থ/বর্জ্যবাহী প্রত্যেক গাড়িতে স্পষ্ট ও দৃষ্টিগোচরভাবে আঁকতে হবে নির্দিষ্ট মাপের একটি বক্স তথা প্যানেল। প্যানেলের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে লিখে ও এঁকে দিতে হবে পদার্থটির পরিচয়—রাসায়নিক নাম, সাধারণ নাম, UN নম্বর তথা SIN, Hazchem Code, শ্রেণীনির্দেশক বরফি। এছাড়াও থাকবে বিশেষজ্ঞের জরুরি পরামর্শ এবং দুর্ঘটনা বা বিপদে সরাসরি দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন নম্বর। রাস্তায় যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে বা পদার্থটি পড়ে যায় বা লিক করে তাহলে প্যানেলের তথ্য থেকে সঠিক প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি নেওয়া সম্ভব।

□ মোটরগাড়ির সামনে পিছনে ও গায়ে উপরিউক্ত তথ্য সম্বলিত প্যানেল ছাড়াও ড্রাইভারের কেবিনে থাকবে অনুরূপ তথ্য সম্বলিত একটি কার্ড—ট্রান্সপোর্ট এমার্জেন্সি কার্ড বা সংক্ষেপে ট্রেমকার্ড (TREM CARD)। যে কোম্পানি বা এজেন্ট গাড়িতে বিপজ্জনক পদার্থ বোঝাই করবে (Consignor), তাদেরই তৈরি করে দিতে হবে ট্রেমকার্ড। আপৎকালীন জরুরি পরামর্শ কার্ডে লেখা থাকবে—ইংরেজী, হিন্দী এবং যে সব

এলাকা দিয়ে গাড়ি যাবে সেই সব এলাকার আঞ্চলিক ভাষায়।

□ বিপজ্জনক মালপত্রবাহী মোটরগাড়ির ড্রাইভারদের শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতা এমন থাকা দরকার যাতে তারা এইসব নির্দেশ ও ব্যবস্থার তাৎপর্য বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনে ট্রেমকার্ড ও প্যানেলের তথ্য ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি নিতে পারে। মোটরগাড়ি বিধিনিয়মে এরকম গাড়ির ড্রাইভারদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা দশম শ্রেণী নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। পরে নানামহল থেকে প্রতিবাদ ওঠায় তা অষ্টম শ্রেণীতে নামানো হয়েছে। কিন্তু তিনদিনের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ তাদের নিতেই হবে।

কোনো গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে ড্রাইভারকে অবশ্যই থানায় জানাতে হবে।

□ মোটরগাড়ি আইন ও তৎসংক্রান্ত বিধিনিয়মের আদেশ

নির্দেশ পালন না করলে বা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না দিলে বা গোপন করলে, বা ভুল তথ্য দিলে, অধিকপক্ষে এক মাসের কারাদণ্ড বা পাঁচশো টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় সাজাই হতে পারে।

(প্রসঙ্গত, পরিবেশ আইন ও তদনুসারী নিয়ম নির্দেশ লংঘনের শাস্তি পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং/অথবা এক লক্ষ টাকা জরিমানা। ড্র.—বি ও বি, অক্টো-ডিসে 1997)।

দেখা যাচ্ছে, বিপজ্জনক প্রক্রিয়ানির্ভরশিল্প থেকে দুর্ঘটনা ও বিপদের মোকাবিলায় শ্রমিক ও স্থানীয় নাগরিকদের কিছু কিছু তথ্য জানার অধিকারকে পরোক্ষে স্বীকৃতি দিয়েছে কারখানা আইন। মোটরগাড়িবাহিত বিপজ্জনক পণ্য বা বর্জ্য সম্পর্কেও এমনটা বলা যায়। কিন্তু কতটুকু পালিত হয় এইসব নীতি নির্দেশ? শ্রমিক-কর্মী ট্রেড ইউনিয়ন বা সাধারণ নাগরিকরাই বা কতটা ওয়াকিবহাল ও সচেতন?

রবীন মজুমদার

জি. এইচ. হার্ডি আর তাঁর ব্রাডম্যান শ্রেণী : আট পাতার পর

নিজের মতামতের ক্ষেত্রে হার্ডি ছিলেন অনড়। তাঁর কিছু বাণী স্মরণীয় হয়ে আছে। যেমন, ‘কখনও কখনও শব্দ জিনিসও বলতে হয়। কিন্তু যেভাবে পারা যায় ততটা সহজ করেই সেগুলো বলা উচিত।’

একটি অল্পবয়সি ছেলে একবার তাঁকে বোঝাতে চাইছিল জেমস জয়েস-এর *ফিনেগান্স্ ওয়েক* [ এক অবোধ আধুনিক উপন্যাস ] চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। হার্ডি শুধু বললেন : ‘তরুণদের আত্মগর্বি হওয়া উচিত : কিন্তু নির্বোধ হওয়া উচিত নয়।’

ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল—কোনো কিছুর ধার না ধেরে হার্ডি জীবন কাটালেন আদর্শ মানুষের মতো। তাঁর চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক, স্বভাব পরোপকারী, বিনয় ও মজ্জাগত। আর পাঁচজন মানুষের মতো তাঁর জীবনেও মাঝে মাঝে অবসাদ দেখা দিত। চারধারে হামবড়া আর ক্লাস্তিকর লোকদের কথা শুনতে বাধ্য হলে তিনি নিজেকে শোনাতে : ‘আমি একটা কাজ করেছি যা তোমরা কখনোই পারতে না। আর সেটা হলো লিটল্‌উড [ কেমব্রিজ-এর এক গণিতজ্ঞ ] আর রামানুজন এই দুজনের সঙ্গে প্রায়

সমান হয়ে একযোগে কাজ করা।’ অর্থাৎ, তিনি নিজে যেন কিছুই করেন নি; ঐ দুই প্রতিভার সহযোগী হতে পারাই তাঁর একমাত্র গৌরব! রামানুজন সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার কাছ থেকে তিনি যা শিখেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি আমি শিখেছি তাঁর কাছে।’

এই যে চরিত্র—এর পেছনে কোনো ধর্মীয় প্রভাব নেই। তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনা গড়ে উঠেছিল স্বাধীন বিচারের ভিত্তিতে। ইহলোকেই জীবনের শুরু ও শেষ—এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি সংপথে জীবন কাটিয়েছেন জ্ঞানের বিস্তারে। স্বর্গের লোভ বা নরকের ভয়—কোনোটাই তাঁকে বিচলিত করে নি।

গণিতজ্ঞ হিসেবে হার্ডিকে ‘ব্রাডম্যান শ্রেণী’তে ফেলা যায় কিনা—সে কথা গণিতজ্ঞরা বলতে পারবেন। তবে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নিশ্চয়ই তাঁকে সেই শ্রেণীতে রাখা যায়।

তথ্যসূত্র :

1. Ram, Suresh. , *Srinivasa Ramanujan*, New Delhi : National Book Trust, 1972.
2. Snow, C.P., *Variety of Men*, London : Macmillan, 1967.

## পোখরান-দুই ও তারপর

পোখরান বিস্ফোরণের ঘটনা দেশজুড়ে যে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল তা স্তিমিত এখন। তবে সেই ঘটনার জের চলছে নানাভাবেই। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চালচিত্রে এই ঘটনা বিশেষ রেখাপাত করেছে বলেও মনে হলো না। সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি রাজ্যের ইলেকশনের ফলাফল সেদিকেই হস্তিত করেছে। পোখরান-পরবর্তী ঘটনাবলীর আভাস দিতে এই লেখা।

মে 1998-এর পোখরান বিস্ফোরণের পর অনেক জল গঙ্গা-সিন্ধুনর্মা দিয়ে বয়ে গিয়েছে। পুরোনো সমীকরণ, সরলীকরণ আর বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির ভাবসাম্যেও পরিবর্তন চোখে পড়েছে অনেকেই। আমরা যখন আমাদের নিউক্লিয়ার বিরোধী সংকলন প্রকাশ করছিলাম, তখন স্পষ্টতই আমরা ছিলাম সংখ্যালঘু। দেশ-রক্ষা দেশপ্রেম এবং অন্যান্য ভাবাবেগের জোয়ারে ভাসমান দেশবাসী পরবর্তীকালে ক্রমশই আমাদের কাছাকাছি মতামতের দিকেই ঝুঁকেছেন বলে মনে হয়।

ইতিমধ্যে হিরোশিমা দিবস কেন্দ্র করে সারা ভারতে যুদ্ধবিরোধী এবং বিশেষত নিউক্লিয়ার অস্ত্রবিরোধী প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয়েছে। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করেছেন এই রাজ্যে। এমনকি চুয়াত্তর সালের 'শান্তির জন্য নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের' সময় আজকের বামফ্রন্টের অংশীদার ছোট-বড়-মাঝারি যে সব শরিক প্রশংসায় ইন্দিরা সরকারের কৃতিত্বে পঞ্চমুখ ছিলেন তাঁরাও অস্ত্রবিরোধী মিছিল করেছেন এবং মিছিলে ঘোষিত বক্তব্যে এবং দাবিতে অন্যদের থেকে ফারাক বিশেষ কিছু চোখে পড়ে নি।

মার্কিন-জাপানি-জার্মান নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধান্ত্র এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যবসায় জড়িত ওয়াল স্ট্রিটের প্রবল পরাক্রান্ত ব্যবসায়ীকুল (দুপ্পঁ এবং তাদের সাক্ষপাঙ্গরা) মার্কিন সেনেটের নিষেধাজ্ঞাকে কলা দেখিয়ে ভারত-পাকিস্তানে দিবা তাদের কলাটা মুলোটা বেচে চলেছে। নিষেধাজ্ঞা কার্যত উঠেই গেছে।

নিষেধাজ্ঞা জারির পরে 'জাতীয়তাবাদে' উদ্বুদ্ধ কেন্দ্রের সরকার ও তদীয় আমলা-বিজ্ঞানী-কুল বিদেশী সাহেবদের অনুগ্রহ না পাওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। সকালে নিউইয়র্ক, বিকেলে বোম্বাই এবং রাতে দিল্লিতে কাটানোয় অভ্যস্ত বিজ্ঞানীদের যখন বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি বাতিল হলো এবং স্বয়ং চিদাম্বরমেরও বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি মিলল না তখন 'জাতীয়তাবাদী' হুঙ্কার যথারীতি কাকুতি-মিনতিতে

পর্যবসিত হলো। মার্কিন দেশে যে সব বিজ্ঞানী নিউক্লিয়ার ও অন্য অন্য যুদ্ধ গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হলো: কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিজ্ঞানীদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়াও হলো। বোমার কার্যক্রমে নিযুক্ত বিজ্ঞানীকুলের যাঁরা বাণপ্রস্থের লীলাভূমি হিসেবে ডলার হাতছানি এলাকার সাড়া পেতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা এই ইয়াংকি 'ইতরামি'তে রাগত হয়ে দুর্বাসা-মূর্তি ধারণ করলেন। যখন সারা ভারতে শিক্ষাখাতে ব্যয় কমছে অথবা মহারাষ্ট্র থেকে বাঙালি বিতাড়ন চলছে, মুম্বই-এ দাঙ্গা ঘটছে তখন এঁরা রহস্যজনকভাবে নীরব ছিলেন! ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একাডেমি, 10 সেপ্টেম্বর 1998 সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছে :

blacklisting Indian nuclear scientists, appears to have sent a shiver down the spine of many, for whom the practice of science necessarily involves extensive travelling abroad. .... the scientific community in India is large and a substantial (but silent) majority does not travel frequently abroad.... It is time to make a virtue of staying at home."

পোখরান হাওয়ায় তরণী ভাসিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার যে প্রকল্প বাজপেয়ী সরকার গ্রহণ করেছিলেন তা বুমেরাং হয়ে ফেরৎ এল। ভারতীয় জনতা পার্টির একচ্ছত্র শাসনাধীন খোদ রাজধানী দিল্লী, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। ভারতের মতো দেশে হঠাৎ পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বহু নিন্দুক অনেক কথা বলেছে। খোদ পোখরানের আমজনতা ভারতীয় জনতা পার্টিকে তাঁদের অঞ্চলে একটিও নির্বাচনী প্রচার সভা করতে দেন নি। তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন পোখরান বিস্ফোরণের সময়, ভূকম্পনের তীব্রতা কমানোর জন্য কেমন ভাবে প্রায় দুহাজার টন পেঁয়াজের বস্তা দিয়ে দেওয়াল তোলা হয়েছিল! পোখরান যে বিধানসভার অঞ্চলে পড়েছে সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধির জামানত আর একটু হলেই

জন্ম হয়ে যেত!

যে চিদাম্বরম বিজ্ঞানীদের মতামত এবং গবেষণার স্বাধীনতা নিয়ে পতাকাবাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই তিনিই চেম্বাই-এর টি জয়রামনকে হুমকিমূলক চিঠি দেওয়ার জন্যে সেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে উশ্কানি দিতে পেছ-পা হন নি। অধ্যাপক জয়রামন, পোখরান বিস্ফোরণের পরে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ তোলেন। ভারতীয় সংবিধান, ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার দিয়েছে, অধ্যাপক জয়রামন, একজন সমাজ সচেতন বিজ্ঞানী হিসেবে, একজন নাগরিক হিসেবে কখনই তার সীমা লঙ্ঘন করেন নি। কিন্তু বোমার সঙ্গে যুক্ত আমলা বিজ্ঞানীদের অসহিষ্ণু মনোভাব এই ক্ষেত্রে আর একবার প্রমাণিত হলো, বিরূপ সমালোচনার জবাব যাঁরা স্বৈরাচার দিয়ে সমাধান করতে চান, সন্দেহ হয় তাঁদের বৈজ্ঞানিক বাগাড়ম্বরের পেছনে অন্য নোংরা উদ্দেশ্য রয়েছে। তবে ভারতের বেসরকারি বিজ্ঞানীরা একজোট হয়ে, চেম্বাইয়ের উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে দফায় দফায় চিঠি-টেলিগ্রাম পাঠান। পরে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী, অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে এই পদক্ষেপের নীতিহীনতা এবং বিজ্ঞানবিরোধী দিকগুলির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যদিও অধ্যাপক জয়রামনকে আপাত কারণ দর্শানো থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই ঘটনা যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। এই ঘটনার মাধ্যমে একদিকে যেমন 'অবাধ্য' বিজ্ঞানীদের শিক্ষা দেওয়ার মনোভাব দেখা গেল, তেমনি 'বাধ্য' হলে কি কি সুবিধা বর্নাধারার মতো নেমে আসবে তারও রেশ পাওয়া গেল। মে 1998 থেকে ডিসেম্বর 1998-এই ছ-সাত মাসে বোমা প্রকল্পের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী কালাম, চিদাম্বরম ইত্যাদিরা কত রকম পদক, পুরস্কার-মানপত্রে ভূষিত হলেন দেখা গেল। আমাদের জানাই ছিল না যে, ভারতে বিজ্ঞানীদের পুরস্কৃত করার এত বন্দোবস্ত বিদ্যমান। আর জানবই বা কেমন করে? বিজ্ঞানী রামন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শত্ৰুঘ্নাথ দত্ত ইত্যাদি বিজ্ঞানীদের তো এমনতরো সম্মর্দন দিতে আমরা দেখি নি কখনও!

নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি চলেছে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশী সাহেবকুলকে তৈলমর্দন করা, বীমা বে-সরকারিকরণ এবং পেটেন্ট আইন সংশোধন প্রায় চূড়ান্ত। উন্নতমানের কয়লার দেশ ভারতে কয়লাখনি রুপ্ত। বেসরকারিকরণ মায় বিদেশীকরণ প্রায় চূড়ান্ত! ডলার-টাকার অনুপাত আর কখনও স্থিতাবস্থায় পৌঁছোবে বলে তো মনে হয় না। ছাঁটাই, শিক্ষাখাতে ব্যয় সংকোচন ইত্যাদি ঝড়ের গতিতে ঘটে চলেছে। দেশের সীমান্তে

সংবাদপত্রের সাম্প্রতিক একটি খবরে জানা গেল যে বিহারের যদুগোড়ায় অবস্থিত ইউরেনিয়াম খনি এলাকায় সার্ভে করে দেখা গেছে যে, স্থানীয় বহুমানুষ তেজস্ক্রিয়তা জনিত নানা অসুস্থতায় ভুগছেন। অনেকে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এজন্য অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেছে বিহারের বিধান পরিষদ। এই রিপোর্ট পাওয়ার পর তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাবিহিত প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে বলেছে। সাথে এও বলেছে যে, অন্যথায় তারা ওই মাইনিং-এর কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার কথাও বিবেচনা করতে পারে। এই উদ্যোগ যে কোনো সুস্থ বিবেকমান মানুষদের প্রশংসা অর্জন করবে তাতে সন্দেহ নেই।

এমন শান্তি বহু দশক ধরে দেখা যায় নি, অথচ দেশ জুড়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি আর সাজো সাজো রব।

পোখরানের পরে পরেই ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি', 'আকাশ', 'ত্রিশূল' এবং 'নাগ' বারম্বার চাঁদপুরের নির্জনতা ভঙ্গ করে আকাশমুখী হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এদের কেউ কেউ সেনাবাহিনীর নিয়মিত অস্ত্রসম্ভারে স্থান করে নিয়েছে। আবদুল কালাম এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ (যিনি চুয়াত্তর সালের পোখরান বিস্ফোরণের কটর সমালোচক ছিলেন) ঘোষণা করেছেন যে, এই ক্ষেপণাস্ত্রের কোনো কোনোটা নিউক্লিয়ার অস্ত্র বহনে সক্ষম। আমাদের দেশ এবং শহর কলকাতাও সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিউক্লিয়ার অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লার মধ্যে পড়ে। আমাদের বিধ্বংসীক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের ক্ষমতা বাড়ছে, আর তত বেশি বেশি করে দেশ বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে।

যে বোমাকে নিয়ে এত গর্ব, এত কিছু, সেই বোমার চরিত্র এবং কারিগরি দক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। সারা বিশ্বের বেসরকারি বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট ভূমিকম্পের তথ্য বিশ্লেষণ করে বাজপেয়ী-কামাল-চিদাম্বরমদের দেওয়া তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রও পান্টা তথ্য দিয়ে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। তবে বেশিরভাগ বেসরকারি বিজ্ঞানীর কাছেই ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের তথ্যাদি এবং বিশ্লেষণ অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

এত জাতীয়তাবাদী হুংকারের পর, আমাদের ভবিষ্যতবাণী প্রমাণিত করে ভারত সম্ভবত সিটিবিটিতে সেই দিতে চলেছে।

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

## শৃঙ্খলিত শিশুদের শৈশবের সন্ধান

নাটক কম দেখেছি। তবু 'হল্লা থেকে বর্ডার' নাটক দেখার লোভ সামলাতে পারি নি, বছর দেড়েক আগে 'নান্দীকার' সংস্থার নাট্যাংসবে। কলকাতার ফুটপাথ বাসিন্দা শিশুদের কল্যাণকামী 'ক্যালকাটা রেসকিউ' (Calcutta Rescue) প্রতিষ্ঠানের শিশুরা অভিনয় করল, হতবাক করে দিল। বিষণ্ণতা, বিপন্নতা নেই অভিনয়ে—অথচ তখন, কলকাতার বিপন্ন শিশু ওরা। কলকাতায় উচ্ছেদের বুলডোজার চলছে। ওরা সে রাইটই হয়তো আশ্রয়টুকু হারাবে ফুটপাথ থেকে—আভাস ছিল। নগর সভ্যতা। মুগ্ধ হয়ে গেছি নাটক দেখে। এ নাটক কেন নিয়মিত হবে না— একশো, দুশো, তিনশো রজনী ধরে?

নেতাজী ইন্ডের স্টেডিয়ামে হাজার দশকে রিক্ত হস্ত শিশু রোদে হেঁটে গেল—শিশুদের অধিকারের নামে। উদ্যোগ 'আইপার' (IPER) কিন্তু মঞ্চ শিশুদের অনুষ্ঠান রাখে নি (শুধু 'মৃত্তিকা'র শিশুরা সুযোগ পেয়েছিল)। হাজার হাজার শিশু অর্ধৈর্ষ হয়ে গ্যালারিতে খেলা করেছে।

কলকাতায় শিশুদের মঞ্চ নেই, নাটক নেই, অনুষ্ঠান নেই, গান নেই। যতটুকু আছে— তাতে শিশুদের শৈশব নেই। একদিকে মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের আধুনিক ম্যানেজমেন্টের শৃঙ্খলিত শিশু অন্যদিকে দারিদ্র্য-যন্ত্রের প্রোডাক্ট বিশাল শিশুবাহিনী। এমনই একটা সময়ে 'শিশুশতাব্দি সন্ধান' গ্রন্থটি হাতে এল। নাট্যের সন্ধানের শুরুতে তীর্থঙ্কর চন্দ্র অপূর্বভাবে শিশুদের শিক্ষা-চিত্র তুলে ধরেছে। শৃঙ্খলিত শিশুদের শৈশবের সন্ধান করেছে। বাস্তব জীবন থেকে আহরণ করা কিছু ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে লেখক, প্রায় একটানে শিশুদের মর্মান্তিক পরিবেশের রূপরেখা এঁকেছে। লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার সাথে মিশেছে অন্যদের পর্যবেক্ষণ। একত্রিশ পাতার পর এসেছে—শিশু নাট্যের প্রসঙ্গ। এখানেও লেখক শিশুদের কাছে আমাদের হাত ধরে পৌঁছে দিয়েছে অপরিসীম দরদে ও দক্ষতায়। বাস্তব ঘটনার সাথে তত্ত্ব-ব্যাকরণ বিশ্লেষণ মিশেছে শিশুনাট্যের গঠনপ্রক্রিয়ায়।

### শিশুনাট্যের সন্ধান

তীর্থঙ্কর চন্দ্র

আবহমান, কাছার, 1998

পরিবেশক : বিশ্বজ্ঞান, 9/3 টেমার লেন, কলিকাতা-9

মূল্য : 30 টাকা।

নিজের মানস-চক্ষু-কর্ণে অনুভব করা যায়—আমাদের স্বার্থসর্বস্ব দৈত্যের হিমশীতভরা বিবর্ণ বাগানে যেন আবার ফুল-পাতা-পাখি ভরে গেল, শিশুদের প্রস্তুতি নাটকের কোলাহলে। তাই এই গ্রন্থ আমাদের সবাইয়ের।

শিক্ষকতা ও শিশুনাট্য—এই দুটি বিষয়েই লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাথে এগ্রন্থে রয়েছে গভীর দরদ ও অধ্যয়ন। শুরু হয়েছে শিশুদের মানসিক বন্দীত্ব, শিক্ষা-কারাগারের প্রসঙ্গ দিয়ে। যেখানে শিশুদের সমস্ত কল্পনা আর স্বতঃস্ফূর্ততার জগত নির্বাচিত নিগূহীত। নিজস্ব কল্পনা ও সৃষ্টির জগতে শিশুদের নিজস্ব বক্তব্য থাকে। তাই প্রস্তুতি হতে দিলে আমরা যে শিশুনাট্য পাই—তা বড়দের রচনা-পরিচালনা-অভিনয় থেকে ভিন্ন। শিশুনাট্যে, শিশুরা মানসিক-মুক্তির স্বাদ ও আনন্দ পায়। শিশুদের রচিত-অভিনীত নাটকের ভিত্তি হলো তাদের নিজেদের জগতের অস্তিত্ব। তাই কাহিনী, সংলাপ ও উপস্থাপনা, শিশুদের স্বাধীন স্বতন্ত্র সৃজনশীলতায় গড়ে ওঠে। আর তারই মধ্যে শিশুদের অবিধ্বাস্য কর্মক্ষমতা প্রকাশ পায়। এ সব নিয়েই 'শিশুনাট্যের সন্ধান'।

জানি, তীর্থঙ্কর আসামের কাছাড়ের স্বতন্ত্র পরিবেশ পেয়েছে নিজের ছেলেবেলায়। যেটা এখন এখনকার ইটের পাঁজর নয়। আর পেয়েছে নিজের মায়ের অসাধারণ নাট্য-সংস্কৃতির পরিবেশ যার পরিচয় পাওয়া যায় আসামের 'আসরাফ আলির স্বদেশ' ছোটো চলচ্চিত্রে হেনা চন্দ্রের অভিনয়ে। সেই পরিবেশ পুষ্ট তীর্থঙ্করকে, শিশুনাট্যের এমন ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্যে, গভীর শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু এই ইন্ট-সিমেন্টের জঙ্গলে, শিশু-কারাগারীরা শিশুদের গাছপালা, মাঠ, পুকুর, বাতাস, দুইমুঠা, শৈশব ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রতি কারাগারে বন্দীর সংখ্যা দুই বা বড়জোর তিন। ইস্কুল-কোচিংয়ের দোরে, সুইমিং পুলের পাড়ে, ক্যারাটের মাঠের ধারে—মায়েরা অতন্ত্র-প্রহরায়, প্রথম বাধা শিশু কারাব্যবস্থা। তবে তো শিশু নাটক—বা অন্য সংস্কৃতি। তীর্থঙ্করের গ্রন্থ পড়তে পড়তে কিছু কথা মনে হচ্ছিল।

বড়রাও তো শৃঙ্খলিত প্রতিবন্ধী নাটক করে—যেটা তাদেরও স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি নয়। প্রসেনিয়াম, থার্ড থিয়েটার সব তাই। বড়রাও কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাহিনী বা অভিনয় করতে চায়—অথচ নিজেরা জানে না। সেটা শিশুনাট্যের থেকে কম মর্মান্তিক নয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিদেশের ও অতীতের ধারা বয়ে বাংলাদেশে তাই চেষ্টা হয়েছিল বড়দের (প্রধানত গ্রামের) স্বতঃস্ফূর্ত নাটক নির্মাণ ও অভিনয়ের। নাম দেওয়া হয়েছিল 'মুক্ত নাটক'। কোনো লিখিত নাটক নেই, অভিনয়ের কঠোর বিধি-নিষেধ নেই। গ্রামের

## উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা—একটি আলোচনা

গত 26 নভেম্বর, '98, কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্টস হলে বন্যাত্রাণ ও প্রতিরোধ সমন্বয় মঞ্চের উদ্যোগে এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। কনভেনশনের শুরুতে সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীসুখেন্দু ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের মালদহ, দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের ভয়াবহ বন্যার বিবরণ দিয়ে বলেন যে, এই বন্যা, এই প্রাণহানি, ফসলের চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের অপরিমেয় দুর্ভোগ কিন্তু অনিবার্য ছিল না। অপরিণামদর্শী নদী পরিকল্পনা, বন্যানিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থার অভাব, জমে-থাকা বৃষ্টির জলের নিকাশের চূড়ান্ত অসুবিধা, সর্বোপরি তীব্র সরকারি উদ্যোগহীন এই বন্যা। এ বন্যা কার্যত মানুষের সৃষ্টি। বন্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও চাপ সৃষ্টিই এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য ছিল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রযুক্তিবিদ, নদী-বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানীও যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন বন্যাপীড়িত ভুক্তভোগী এবং বন্যাদুর্গত অঞ্চলের ক্রিয়াশীল বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচবিভাগের প্রাক্তন মুখ্য-ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসীতাংশুশেখর গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন যে, নদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রতিবাদী পরিকল্পনাবিদদের বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত হলেও, বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা নির্মূল হতো একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে বর্তমানের নদী পরিকল্পনার রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের সংযোগের অভাবের দিকটা তিনি তুলে ধরেন। তাঁর মতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বন্যানিয়ন্ত্রণের structural ব্যবস্থার সবটাই ব্যর্থ হয় নি। Non-Structural ব্যবস্থার মধ্যে, বন্যার আগাম সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে বন্যার সময়ে আক্রান্ত

শৃঙ্খলিত শিশুদের শৈশবের সন্ধান : সাতাশ পাতার পর

মানুষ নিজেরা কাহিনী-সংলাপ অভিনয় করে। বড়রা তো বড়দের জন্যেই এই নাটকচর্চার আন্দোলন করল না।

মনে পড়ে শিশুচিত্রকলার অনন্য সংগ্রামী সিটসেকের কথা। সিটসেক (Franz Cizek) অস্ট্রিয়ায় জন্মেছে 1965 সালে। এ শতকের গোড়ায় সিটসেক শুরু করেছিল, শিশুচিত্রকলার নতুন ধারা। শিশুদের ছবি আঁকতে শেখানো নয়—তারা যেমন প্রাণ চায় আঁকবে। সেটাই তো শিশু-শিল্পকলা। বিতর্ক সমালোচনার বাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সিটসেক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

মানুষকে ঠিক কি কি করতে হবে, তা নির্দিষ্টভাবে জানানো হয় না। বন্যা প্রবন্ধন (Flood-management) নিয়ে ব্লক-স্তরে, জেলা-স্তরে এবং রাজ্য-স্তরে সরকারি আয়োজনে যে সভা-সমাবেশ হয়ে থাকে, তাতে সম্ভাব্য বন্যা-পীড়িতের সংগে সংযোগ রক্ষাই হয় না। নদীর প্লাবনভূমির কার্যকর নিয়ন্ত্রণের ওপরই তিনি জোর দেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ ড. সুনীশ সেনশর্মা (Geological Survey of India-র পূর্বতন অধিকর্তা) 1980 সালে গঠিত National Flood Commission-এর কাজের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, বন্যানিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নদী পরিকল্পনার বিজ্ঞানসম্মত দিকটার সাথে সাধারণ ভুক্তভোগী মানুষের বন্যাজনিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উপযোগিতার প্রশ্নে এই Commission-এর সুপারিশ সার্থক মেল-বন্ধনের চেষ্টা করেছিল। পরিকল্পনায় আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞের খোঁজ খবর দেওয়ার কাজে সাধারণ মানুষ যে কি অসাধারণ ভূমিকা নিতে পারে, তা Commission বলিষ্ঠভাবে বিবেচনা করেন। তাঁরমতে সরকার কর্তৃক এই Commission-এর সুপারিশগুলি কাজে পরিণত না করা একটা চূড়ান্ত ভুল।

সেচ-বিশেষজ্ঞ ভোলানাথ আইচ গুরুত্ব দেন বন্যা-প্রবণ জায়গার চিহ্নিতকরণ, Flood-shelter নির্মাণ, বন্যার আগাম সতর্কীকরণ, বন্যাত্রাণ ও বন্যানিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে Institutional Financing এর প্রয়োজনীয়তার ওপর। প্লাবনভূমির map তৈরি, সাধারণ মানুষের কাছে তার সহজলভ্যতা, সাধারণের সেই map পড়তে পারার ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্ব পায় তাঁর কথায়। Flood-shelter-এ পৌঁছানোর identification rout-এর পরিচিতি এবং তার সাথে বাইরের যোগাযোগের দিকটাও বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

বন্যানিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে যুক্ত বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে নজর কাড়েন শ্রীশেখর দত্ত। শ্রীদত্ত মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা এবং নদীভাঙন নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। নদী

পূর্ব বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আলোড়ন তুলেছিল শিশু-চিত্রকলায়। আমরা ভাবতেই পারি না।

তীর্থঙ্করের গ্রন্থে বর্ণিত কোনো শিশু আকাশটা সবুজ রঙ করতে চাইলে আঁকার শিক্ষক তিরস্কার করেছে। কিন্তু শিশুর কাছে সেটাই তো শুধু স্বাধীনতা নয়—সেটাই তো শিল্পকলা। আকাশের রঙ সবুজ—এমন দুঃসাহসী কল্পনা, শিশুরাই করতে পারে।

সোমেন গুহ

পরিকল্পনার যথার্থতাকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফারাক্কা ব্যারের উদাহরণ দিয়ে শ্রীদত্ত বলেন যে মূলতঃ কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্যই ফারাক্কা ব্যারের নির্মাণ। কিন্তু এর ফলে আজ পর্যন্ত কলকাতা বন্দরের কতটুকু উন্নতি ঘটেছে তা সবিস্তারে কেউ বলতে পারেন না। কিন্তু এই ব্যারের নির্মাণের ফলে মুর্শিদাবাদের বহু গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং বর্তমানেও যাচ্ছে। এর ক্ষয়ক্ষতির হিসাব অনেক অনেক বেশি। শ্রীদত্ত বিশেষজ্ঞ মতামতে বিশেষ নিরাশ। অপর গণসংগঠনকর্মী ইলিয়াস গাজী সাহেবের Flood-shelter স্থাপনে সরকারি ব্যর্থতাকেই মালদার বন্যার ভয়ানকত্বের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন।

কন্ভেনশনে একগুচ্ছ প্রস্তাব নেওয়া হয় বন্যা ত্রাণ ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

1. উত্তরবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চল জুড়ে এ বছরে যে বন্যা হয়েছে তা বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে সবচেয়ে ভয়াবহ। এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি অনিবার্য ছিল না। বন্যা-পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতির অভাব, এবং বন্যার সময়ে ত্রাণ ও চিকিৎসার অপ্রতুলতা কার্যত এই জীবনহানি ও সম্পদহানির জন্য দায়ী।
2. আগাম প্রস্তুতি ও ত্রাণ এবং চিকিৎসার আয়োজনে সরকার শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। বন্যার্ত মানুষের জন্য ত্রাণব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ মূলত জন-বিরোধী থেকে গেছে। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ও দলীয় স্বার্থ।
3. নদী পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রতিবাদী বিশেষজ্ঞ মতামতের পূর্ণ উপেক্ষা বন্যার ভয়াবহতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। চলতি পরিকল্পনাগুলির জনবিরোধী চরিত্র ও

অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বারংবার প্রতিবাদী বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা সরকারের গোচরে আনতে চেপ্টা করেছেন। পরিকল্পনা রূপায়ণোত্তর পর্যায়ে প্রতিবাদী বিশেষজ্ঞ মতামতের আশংকা সত্যে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও, সরকারি তরফে চলতি পরিকল্পনাগুলির পুনঃ পর্যালোচনার উদ্যোগের অভাব বিশেষ নিন্দনীয়।

4. ভারতে নদী-পরিকল্পনা ও সেচনীতির রূপায়ণ মন্ত্রী, আমলা এবং ঠিকাদার-নির্ভর। এর সাথে গণঅভিজ্ঞতা বা গণউদ্যোগের মেলবন্ধনের চেপ্টা কখনও করা হয় নি। ফলে রূপায়িত প্রকল্প চরিত্রে জনস্বার্থবিরোধী থেকে গেছে। একথা আজ প্রমাণিত যে, দেশের জলসম্পদের ব্যবহার, নদী প্রকল্পের প্রণয়ন ও সেচনীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ ও দেশের প্রকৃতিকে বিসর্জন দিয়ে দেশী-বিদেশী মুনাফাখোরদের স্বার্থই রক্ষিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে কন্ভেনশনের মূল দাবির মধ্যে উল্লেখনীয় :

□ নদী পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহের রূপায়ণে মানুষের ও পরিবেশের স্বার্থের অগ্রাধিকার...

□ বন্যার ক্ষয়ক্ষতিকে ভবিষ্যতে কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে দেশজ নদনদী ও সেচপরিকল্পনা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা, নূতন জনমুখী নীতির রূপায়ণ...

□ বর্তমানের বন্যাদুর্গত অঞ্চলে চিকিৎসার সমস্ত দিক থেকে সুবেন্দোবস্ত, পানীয় জলের সরবরাহের সুনিশ্চিতকরণ, ভেঙ্গে পড়া রেশন ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তথা পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির পুনর্নির্মাণ।

কন্ভেনশন উপলক্ষ্যে এবারের বন্যায় গৃহীত আলোকচিত্রের এক সমাবেশ ছিল সেদিনের সন্ধ্যায় যা মনোগ্রাহী ও উল্লেখের দাবি রাখে।

ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী

## হাকার বৃত্তান্ত

বিদেশী কিছু সাহেব ছোকরা কায়দা করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের কম্পিউটারে ঢুকে পড়ে সোরগোল তুলেছে এখানকার বাজারে। আসলে এমন কিছু বাহাদুরির ব্যাপার-ই নয়। পশ্চিমের দেশে দেশে ওখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কঠোর নজরদারি এড়িয়ে হামেশাই এমনটা করে থাকে ওখানকার অলস-মস্তিষ্ক ছেলেপুলেরা। আসলে নিছক মজার জন্য একটা করে থাকলেও BARC-র হোমপেজে উক্ত ছেলেপুলেরা যে সমস্ত বাণী ফেলে রেখে গিয়েছিল তার মধ্যে অত্যন্ত নিম্ন-রুচির স্বাক্ষর রেখে গেছে। তার মধ্যে যে সুরটা নিহিত ছিল তা সাদা চামড়ার সুবাদে যে কাউকে হেয় করা বা যে কারোর ওপর দস্যুবৃত্তি চালানোর অধিকার তাদের আছে এমনটাই ফুটে উঠেছে। যেটা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়।

## প্রাথমিকে ইংরেজী

এখন থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ইংরেজী পাঠ শুরু করবে ক্লাস-টু থেকে। অবশ্যি ঠিক ক্লাস-টু থেকেও নয়—থ্রি থেকে। ক্লাস-টু-তে শুরু হবে হালকা ভাবে। কেবল মুখে মুখে শেখা।—ক্যাট-হ্যাট-ব্যাট। ক্লাস-থ্রি-তে গিয়ে লেখা এবং পড়া। জোর কদম শুরু।

বেশ অভিনবত্ব আছে এই ঘোষণায়। তাবলে ছটছাট এসব এসেছে এমন নয়। এজন্য রীতিমতো বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হচ্ছে। বেশী সংখ্যায় বিশেষজ্ঞের অভাব হলে একজন দিয়েই কমিটি হচ্ছে। সেই কমিটি সব দিক বিচার বিবেচনা করছেন। সার্ভে করছেন। পরিসংখ্যান নিচ্ছেন। দেশী বিদেশী বই দেখছেন। ভাষা শিক্ষা নিয়ে যাবতীয় বিদেশী তত্ত্ব খেঁটেখুঁটে দেখছেন। তারপর সুপারিশ করছেন। ঠিক কোন ক্লাস থেকে ইংরেজী শিক্ষা শুরু করা সর্বোৎকৃষ্ট। এই নিয়ে গত বিশ বছরে বার কয়েক কমিটি বসল। সুপারিশ এল। প্রতিবারই ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশ। ক্লাস সিন্স, ক্লাস ফাইভ—এবারে একসাথে ক্লাস টু-থ্রি। এর মধ্যে এই রাজ্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থা খুব একটা বদলেছে এমন নয়। তবে সমাধান বদলেছে আর সব কটিই সব থেকে সঠিক সমাধান!—তাহলে? আসলে পারিপার্শ্বিক না বদলালেও কমিটি বদলেছে তো।—তাই।

সাম্প্রতিকতম কমিটি ছিল একজনের কমিটি। তার হাতে সময়ও ছিল কম। তাড়াছড়ো করেই রিপোর্ট দিতে হয়েছে। তাই তত্ত্ব-পরিসংখ্যান নিয়ে ঘাঁটাঘাটির সময় বিশেষ মেলে নি। তবুও বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট বলে কথা। ‘ইজ্জত তো আছে একটা’। এক কথায় তো দাওয়াই বাতলানো যায় না। তাই খানিক গৌরচন্দ্রিকা না হলেই নয়। এবং অবশ্যই তাকে অ্যাকাডেমিক মৌলিক হতে হবে। ফলে এই কমিটিকে কিছু নতুন কথা বলতে হয়েছে। বলতে হয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষাশিক্ষার সমস্যার কথা। তাদের এমনিতে বাংলা শিখতেই হয়। সেটাই তাদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে ভিন্ন। তার ওপর আবার একটি বিদেশী ভাষার চাপ। সেই হিসেবে তাদের ওপর ইংরেজী শিক্ষার বোঝা চাপানো—এক ধরণের অবিচারই বটে। তবুও বৃহত্তর(!) স্বার্থের খাতিরে প্রাথমিকস্তরেই ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে তাকে রায় দিতে হচ্ছে। With heavy heart কি?

তবে হেভি হার্ট না হলেও হাই রিস্ক-এর মধ্যে দিয়ে যে যেতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এর আগের সব কমিটি-ই

জানতেন ওপরতলা কি চান। এবারে সেইখানটাতেই ছিল বিভ্রাট। ছিল ভিন্নমত। ভিন্ন মতাবলম্বী সকলের ওজন আবার সমান নয়। কারো বেশি কারো কম। কারো আবার খুব-ই বেশি। হাওয়া বুঝে এর মধ্যে কেউ কেউ আবার মতামতে অস্পষ্ট রয়েছে। ফলে কমিটিকে অতি সূক্ষ্ম হিসেব কয়ে এঙতে হয়েছে। একেবারে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা আর কি!

যেহেতু ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপার তাই তিনি সম্ভবত এবার ভাষা-তত্ত্ব নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান বইয়ের সূত্রের ওপরই নির্ভর করেছেন। তিনি সরল দাঁড়িপাল্লার নিয়মটি প্রয়োগ করেছেন। পাল্লার দুদিকে ওজন সমান হলে—দণ্ড সমান থাকবে এটাই নিয়ম। আলম্ব বিন্দু সেক্ষেত্রে অবশ্যি মধ্যখানে থাকে। কিন্তু দুপ্রান্তে ওজন যদি ভিন্ন হয় এবং তথাপিও যদি দণ্ডটিকে অনুভূমিক রাখতে হয় তাহলে তো আলম্ব বিন্দুকে সরাতেই হবে। এবং যে প্রান্তে ওজন বেশি সে দিকেই সরাতে হবে। তিনিও তাই করেছেন। দেখেছেন তিনি এবার দলের সব থেকে ওজনদার বাটখারাটিই প্রাথমিকস্তরে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষেই। ফলে আলম্বটিকে সেদিকেই ঠেলে দিয়েছেন। কুচোকাঁচা বাটখারার হিসেব কষতে গিয়ে উত্তরটা পূর্ণসংখ্যায় বেরোয় নি। দুই তিনের মাঝামাঝি এসেছে। কিছু করার নেই—বিশেষত সমস্যাটা যখন ভারসাম্যের!

শুধু ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা নয়, প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা নিয়েও কিছু ঘোষণা বেরিয়েছে এরই সাথে। প্রাথমিক স্তরে বৎসরান্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে পাশ-ফেলের ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা বদলানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষা ফের চালু হবে। যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে এজন্য, তা এক কথায় অনবদ্য। বলা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় অগ্রগতি বিচারের জন্য এই পরীক্ষা নয়। শিক্ষক শিক্ষিকাদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য!—ওরু-কুল সাবধান।

এমন সব ঘোষণায় কচিকাঁচার কতখানি উৎফুল্ল সে সংবাদ খবরের কাগজ দেয় নি। তবে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল যে আনন্দে বেহাল জানা গেল তাদের মুখপাত্রের লাগামছাড়া উচ্ছ্বাসে। তিনি বলেছেন—‘এটা আমাদের ঐতিহাসিক বিজয়’। রাজ্যজুড়ে ‘বিজয় মিছিল’ করা হবে এজন্য।—সর্বনাশ! *কিওকি* র পাতায় এই আশাঙ্কটাই করা হয়েছিল এর আগে। আবারও একটা মিছিল। আবার রাস্তায় নামানো হবে কচিকাঁচাদের! হাতে পোস্টার—? কি লেখা থাকবে এবার?

### সংযোজন

এখানেই শেষ নয়। আরেক দুঃস্বপ্নের জন্য প্রস্তুত হতে হবে রাজ্যবাসীদের। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ছোট দলের এই

সাফল্যে উৎফুল্ল। এবং উৎসাহিত। কেন ক্লাস টু?— আরও আগে থেকেই কেন ইংরেজী পড়ানো হবে না এই তাদের প্রশ্ন। ফলে তারাও আন্দোলনে নামাচ্ছেন এবার। এই ইসুতে। তাদের ছাত্র-যুব উইংকে সাজগোজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাটক শুরু হল বলে।— লড়াই লড়াই লড়াই চাই। লড়াই করে.....। সত্যিই দলের বাঁচা-মরার সমস্যা বলে কথা। গাড্ডায় পড়লে কি না ধরতে হয় আঁকড়ে!

র.চ.

□□□

## পরিবেশ পাঠ : কলেজে এবার

পরিবেশ পাঠ এতকাল স্কুল স্তরেই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও ছিল কোথাও কোথাও। এবার কলেজেও ঢুকছে। অন্তত সেই রকমই শোনা যাচ্ছে কানা-ঘুঘোয়। পরিবেশ ভাবনার বয়স এমনিতে বেশি নয়। ছিল আন্দোলন। তার থেকে হয়ে উঠল 'বিষয়'। মানে অ্যাকাডেমিক বিষয়। শুধু আমাদের এখানেই নয়। সবখানেই। একটি ভাবনার উদয় হওয়া, লোকমুখে ছড়িয়ে পড়া অ্যাকাডেমিক বিষয় হয়ে ওঠা এবং অবশেষে পাঠ্য তালিকায় ল্যান্ড-আপ করা —সব চোখের সামনে ঘটল!

এখানে যারা আজ বিষয়টিকে পাঠ্যসূচীতে ঢোকাতে চাইছেন, ঠিক কি কারণে চাইছেন জানা নেই। পরিবেশ শিক্ষার নামে ঠিক কি বার্তা পৌঁছতে চাইছেন তাও অজানা। এদিকে 'পরিবেশ' সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাগুলো এখনো বেশ গোলমেলে। সকলেই সরব পরিবেশ নিয়ে। এর মধ্যে পরিবেশ সমস্যা তৈরি করছেন, আমদানি করছেন, রপ্তানি করছেন, তারা আছেন। আবার এই সমস্যায় ভুগছেন, দেখছেন বা দূর থেকে ভাবছেন— তারাও আছেন। ফলে এদের সকলেই একরকম বলবেন, এই সমস্যার উৎস একরকম বলে ভাববেন এবং সমাধান এক পথে খুঁজবেন—হতে পারে না। হতেও না তাই। একটু কান পাতলেই টের পাওয়া যায় সমবেত কঠিনভাবে কোনো তালের বালাই নেই। ক্যাকোফোনি আর কাকে বলে! ফলে 'কাদের পরিবেশ টা অবশেষে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে সেটাই দেখার এখন। মনে রাখতে হবে মার্কসবাদীরা কিন্তু শুরুতে এই সমস্যাটিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। এটাকে পূঁজিবাদীদের নতুন একটা ধাপা বলে মনে করতেন। ছাত্র ও যুবকদের বিভ্রান্ত করা যার উদ্দেশ্য! এখন সেটাই পাঠ্যসূচীতে ঢোকানো হবে! এদিকে আরেক গোল বেঁধেছে। কলেজের কোর্স মানে তো তিনটে প্রধান বিভাগ— সাহিত্য, বিজ্ঞান আর বাণিজ্য। একেবারে লক্ষণ রেখা দিয়ে

সীমানা ভাগ করা বিভাগ। ফলে শুরুতেই একটি মৌলিক সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। পরিবেশ কার এক্তিয়ারে যাবে—সাহিত্য বিজ্ঞান না বাণিজ্য বিভাগের। বিজ্ঞান বিভাগের হক সব থেকে বেশি। এটাই মনে হয়েছিল অনেকের। কিন্তু বাণিজ্য বিভাগের কেন নয়—প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়ে। ফলে 'কনফিউশন' থেকেই যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে 'ওপর থেকে' নির্দেশ এসেছে—'পরিবেশ সবার'। অর্থাৎ পড়তে হবে সবাইকেই। সাহিত্য বিজ্ঞান বাণিজ্য—যে বিভাগের ছাত্রছাত্রী হোন না কেন কলেজে পড়তে হলে পড়তেই হবে—'বিষয় : পরিবেশ'। বাস, ফাঁপরে পড়েছেন সিলেবাস রচয়িতারা। প্রশ্ন উঠেছে সিলেবাস কি এক রকম হতে পারে-বিজ্ঞানের পরিবেশ, বাণিজ্যের পরিবেশ আর সাহিত্যের পরিবেশ বিভাগের? একেই তো পরিবেশ বিষয়টাই ধোঁয়াটে—তায় আবার সাব-ডিভিশন।—উফ!

তবে সব কিছুর গূঢ়ার্থ নিয়ে যাদের মাথাব্যথা তারা এই সমস্ত ডিটেল নিয়ে ভারতেই রাজি নয়। তাদের ভাবনা অন্য লাইনে। একটি আশুবাণ্য মনে করিয়ে দিতে চাইছেন, 'কোনো কিছুর ধার যদি ভেঁতা করতে চাও তো তাকে ঢুকিয়ে দাও পাঠ্যতালিকায়'। সেটাই নাকি এর উদ্দেশ্য। আসলে পরিবেশ নিয়ে রাস্তায় হেঁটে হট্টগোল আর ভালো লাগে না। 'সিরিয়াস' ব্যাপারটা 'কোজি এনভায়রনমেন্টে' চর্চিত হোক—সেটাই ভালো নয় কি?

র.চ.

□□□

## মানবাধিকার : মার্কিনী ভ্যারাইটি

মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। গত ডিসেম্বরে। বহু অনুষ্ঠান হল এই উপলক্ষে। নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দেশের সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন এব্যাপারে। যে যার মতো উদ্যাপন করল উপলক্ষ্যটি। বেশিরভাগই বক্তৃতার মাধ্যমে। ব্যতিক্রম মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকার। এরা মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্যাপন করল ইরাকের ওপর মিসাইল ও বোমা বর্ষণ করে। নিরস্ত্র ও নিরপরাধ মহিলা শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যুবা-যুবতীকে হতাহত করে।

—অজুহাত ? সাংঘাতিক অজুহাত। ইরাকের প্রেসিডেন্ট গোপনে মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র মজুত করছে। যেটা সে দেশের জনগণ এবং আশপাশের দেশগুলির পক্ষে নাকি বেজায় বিপজ্জনক! সেজন্য মানব-দরদী মার্কিন বাহিনীকে এত কষ্ট

করে হাজার হাজার মাইল উজিয়ে গিয়ে এহেন হানাদারি করতে হল। সাথে ব্রিটিশ বাহিনীও ছিল। মার্কিন-বাহিনীর 'মনোরঞ্জনকে লিয়ে' নাকি ?

দু'একটি দেশ ছাড়া বিশ্বের অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা এই আচরণের নিন্দা করেছেন। নেহাতই মামুলি নিন্দা। ব্যস্। একজোট হয়ে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নয়। মানবাধিকার রক্ষার তদারকির জন্য নিযুক্ত রাষ্ট্রসংঘও থেকেছে নির্বাক দর্শক হয়ে। আসলে সকলেই আন্তঃপৃষ্ঠে বাঁধা স্বার্থের দড়িতে। মানবাধিকারের বিশ্বজনীনতার মতো ভাবালুতার স্থান কোথায় সেখানে ?

যাদের জন্য এহেন অযাচিত হানাদারি তারা কি বলেন ? তারা কি আনন্দে উদ্বাহ হয়ে নৃত্য করছেন ? নাকি আহ্লাদে মার্কিন ও ব্রিটিশ কর্তাদের গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমো দিচ্ছেন ?—না, তেমন কোনো খবর চোখে পড়ল না। দুর্ভাগ্য দুই রাষ্ট্রপ্রধানের। তা বলে কি লজ্জিত তারা ? মোটেই নয়; এর পরেও গজরাচ্ছেন—দরকার (!) হলে নাকি ফের হানা দেবেন ! কিন্তু এবার কেন না সেই পাপিষ্ঠকে নিকেশ করে ছাড়লেন তারা ? উত্তরে বলেছেন—এবারের মতো নাকি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ! গুঁড়িয়ে দেওয়া গেছে মারণ-গ্যাসের ভান্ডারগুলো। মন্দ লোকেরা প্রশ্ন তুলেছে তাঁলে বিষ বাস্পগুলো গেল কোথায় ? ছড়িয়ে পড়ল না কেন ইরাকের বাতাসে ? নাকি ইরাকি জনগণের স্বার্থে ওই বিষ দুই রাষ্ট্রপ্রধান ভাগাভাগি করে কঠে ধারণ করে নিয়েছেন ?

গণতন্ত্রের পীঠস্থান ওই দুই দেশের আমজনতা কি বলেন ? তাদের চিত্ত কি খুব উদ্বেলিত এই ঘটনায় ?—মনে তো হয় না। বিবেকবান কিছু মানুষ থাকেন সব দেশেই। সে দেশেও আছে। তারা ব্যথিত হয়েছেন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ প্রতিবাদে পথেও নেমে পড়েছেন। ধিক্কার জানিয়েছেন সরকারের আচরণে।

কিন্তু সংখ্যায় তারা কতটুকু ? খুবই নগণ্য। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সভ্যতা সচেতনতার দাবিদার দেশের পক্ষে। আসলে উন্নত দেশ তো—তাই বিটকেল রাজনৈতিক ব্যাপার-স্বাপার তাদের না-পসন্দ। তবে এই জনগণের দয়ায় ঘরোয়া কলেঙ্কারিতে বিপর্যস্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘেঁটে যাওয়া পপুলারিটির রেটিং নাকি উর্দ্ধমুখী এই ঘটনার পরে। না, রাজনীতিতে রুচি নেই সেদেশের বেশিরভাগ মানুষের। তবে কি প্রেসিডেন্টের ফেসিয়াল করা মুখ দেখে এই রায় ? —লা জবাব এই টনটনে সচেতনতার আসলে সে দেশের আমজনতার মনের খোঁজ-খবর যারা রাখেন তারা জানেন যে বেশিরভাগেরই মনের ভাব খুদে-ক্রিস্টন মার্কাই, মনে মনে বিশ্বাস করে— 'বেয়াদপি করলে শাস্তি তো পেতেই হবে' —হ্যাঁ, শক্তিদ্বার রাষ্ট্রের কার্যক্রম এবং প্রচারযন্ত্র এইভাবেই গড়ে তোলে আম জনতার গোষ্ঠী চেতনা। আচ্ছন্ন সেই চেতনায় ধরা পড়ে না কার পাপে কার দণ্ড হল। বেয়াদপ ইরাকি প্রেসিডেন্ট কিন্তু আছে বহাল তবিয়েতেই। তাতে কি আসে যায় ?

মানবাধিকারের বিশ্বজনীন সনদ বস্তুতপক্ষে আজো কিছু ভালো ভালো কথার দলিলমাত্র। যা দুর্বলের জন্য সাফনা হতে পারে, কিন্তু সবলদের যথেষ্টাচারের পথে কোনো বাধাই নয়। জোর যার মুল্লুক তার এটাই সত্য। এখনও এই বিংশ-শতাব্দীর শেষপাদে এসেও। জোর যার অল্প সে নিজের দেশের মানুষের ওপর বিক্রম দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকে। জোর যার বেশি সে দেশের সীমানা মানে না। বিক্রম দেখায় যেখানে যখন খুশি— হিরোশিমায়, ভিয়েতনামে, কোরিয়ায়, কিউবায়, চিলিতে বা ইরাকে। আমরা কৃতার্থ বোধ করি সেই শক্তিদ্বারদের কৃপায় (!) তৈরি মানবাধিকারের সনদের সুললিত বাণী পাঠ ও প্রচার করে !

র.চ.

## NABODAYA CULTURAL TROUPE

(Creative Dance & Music Centre)

10/39, Bijyogarh, Calcutta 700 032

Phone : 412 5975

## বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী প্রকাশনা

পোখরান বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত

# নিউক্লিয়ার বোমা নয়

## বিষয়সূচী

Science, Politics & the Bomb—T. Jayaraman □  
ভারত ও পাকিস্তানের অস্ত্র প্রতিযোগিতা সম্পর্কে পারভেজ হুডভয়  
□ পোখরান গ্রামের মানুষের সাথে জাপানের হিবাকুশাদের  
সাক্ষাৎকার □ গ্রীনপিস প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার □ সি টি বি টি-র  
স্বরূপ □ বিজ্ঞানের বিতীষিকা — রাজশেখর বসু □ পরমাণবিক  
জাতীয়বাদ ও পারমাণবিক অহিন — কৃষ্ণ অহিয়ার □ পাগওয়াশ  
আন্দোলনের পটভূমি □ ভিয়েনা ঘোষণাপত্র □ পরমাণু অস্ত্র  
বিরোধী আন্দোলন □ পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দের প্রতিবাদ পত্র

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : বুক মার্ক, নিউ হরাইজন, উৎস মানুষ এবং বিওবির যোগাযোগ  
কেন্দ্র—নরমান বেথুন জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অফিস